Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান:একটি তুলনামূলক বিশ্লেষন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসাঃ আলিফনুর খাতুন

রোলঃ 228021028

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান:একটি তুলনামূলক বিশ্লেষন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসাঃ আলিফনুর খাতুন

রোলঃ 228021028

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান:একটি তুলনামূলক বিশ্লেষন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোসাঃ আলিফনুর খাতুন, আইডিঃ 228021028 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান:একটি তুলনামূলক বিশ্লেষন " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

আলিফনুর

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

মোসাঃ আলিফনুর খাতুন

আইডিঃ 228021028

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা:......................................5

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ......................................5

মহাবিশ্বের সৃষ্টি - বিগব্যাং তত্ত্ব......................................11

নক্ষত্র-গ্রহ-উপগ্রহ নিজ নিজ কক্ষপথে ঘোরে......................................12

সূর্যের আলো উৎপাদন প্রক্রিয়া......................................15

সূর্যের শেষ পরিণতি......................................16

ব্ল্যাকহোল - নক্ষত্র পতনের স্থান......................................17

মহাবিশ্বের বিশালতা......................................19

মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল......................................22

চাঁদের মনযিলসমূহ (Lunar Station)......................................23

পৃথিবীতে চাঁদ ও সূর্যের গুরুত্ব......................................24

আকাশের সংরক্ষক ভূমিকা......................................28

আকাশে কোনো ফাটল নেই......................................29

লোহার সৃষ্টি পৃথিবীর বাইরে......................................32

বজ্রঝলক- বজ্রধ্বনি- বজ্রপাত......................................34

গাছপালা আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে......................................36

পানি চক্র......................................38

পর্বত সৃষ্টির রহস্য......................................40

প্রবহমান দুই নদী......................................43

সাগরের গভীরে অন্ধকার......................................46

পৃথিবীর জীবনের সাথে মশার তুলনা......................................49

মৌমাছির জীবন যাপন পদ্ধতি......................................51

পিপীলিকার জীবন যাপন পদ্ধতি......................................52

মাকড়সার ঘর সবচেয়ে দুর্বল 55
আঙুর - খেজুর - মধুর উপকারিতা 55
মধু ও তার উৎস..56
উট আল্লাহর এক অপূর্ব নিদর্শন 58
দুগ্ধ উৎপাদন প্রক্রিয়া 60
পানি হতেই সকল প্রানের অস্তিত্ব 61
মানবজাতিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন 63
ডারউইনের মানব বিবর্তনবান একটি জঘন্য মিথ্যাচার..65
মানব সৃষ্টি প্রক্রিয়া..67
মানবদেহ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য 69
রুহ বনাম বিজ্ঞান...77
স্বামী - স্ত্রীর ভালোবাসার রহস্য...80
স্তন্যপানকাল ২ বছর...85
আল ইসরা ওয়াল মিরাজ...86
সমকামিতা বনাম এইডস...89
মদ হারামের বৈজ্ঞানিক কারন..91
সুদের মধ্যে নেই কোনো বরকত 93
গান - বাজনার অপকারিতা 96
গুনাহের প্রতি নিষেধাজ্ঞার বৈজ্ঞানিক কারণ..97
ধৈর্য ধারণের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব..101
সালাত আদায়ের বৈজ্ঞানিক রহস্য...104
সালাতের তিন নিষিদ্ধ সময়...105
কীবলামুখী হয়ে নামাজ পড়ার বৈজ্ঞানিক রহস্য 107
ওযুর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি 109

বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন পাঠের গুরুত্ব..111
আখিরাতের অন্তহীন জীবন..113
জান্নাতের বিশালতার প্রমাণ...116
রেফারেন্স...119

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝

ভূমিকা:

কুরআন এবং বিজ্ঞানে রয়েছে বিশাল সামন্জস্যতা।আদিকাল থেকেই মানুষ প্রকৃতির নানা বিষয় নিয়ে জানার ইচ্ছা পোষণ করে আসছে।আর এই থেকেই শুরু নানা গবেষণা। গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন নতুন বিষয় আবিষ্কারের নামই বিজ্ঞান।যদিও বিজ্ঞান মতে এসব আবিষ্কার নতুন। কিন্তু কুরআন নিয়ে বিশেষভাবে গবেষণা করলে দেখা যায় বিজ্ঞানের এসব "নতুন" বলা আবিষ্কারের বর্ননা সেই ১৪০০ বছর পূর্বেই মহান আল্লাহর প্রেরিত কিতাব আল কুরআনে বলা আছে।তাই মুসলমানগন যেটা ১৪০০ বছর আগে থেকেই জানে সেটা বিজ্ঞানীরা এখন আবিষ্কার করে কুরআনের সত্যতা আরো স্পষ্ট করে দিচ্ছে। বিজ্ঞানের এসব নতুন নতুন আবিষ্কার প্রতিটি ইমানদ্বার ব্যক্তির ইমান আরো মজবুত করে।কোনো বিবেকবান সত্যানুসন্ধানী জ্ঞানী মানুষের পক্ষে আল কুরআন যে মহান আল্লাহর প্রেরিত ঐশী বানী এই সত্যতাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।যেমনঃ প্রায় ১৪০০ বছর আগে থেকেই নবী (সাঃ) এর হাদীস থেকে মুসলমানরা এটা জানে যে কিয়ামতের পূর্বে যেসব আলামত প্রকাশ পাবে তার অন্যতম একটি নিদর্শন হলো সূর্য পশ্চিম আকাশে উদিত হবে।কিছুদিন আগেই বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বলেছেন যে সূর্য পশ্চিম আকাশে উদিত হবে।সুবহানাল্লাহ! নবীজীর বলা কথা কত নির্ভুল তা বিজ্ঞানীরা নিজের অজান্তেই আবারও প্রমাণ করে দিল।নবীজিকে এই নির্ভুল জ্ঞান দান করেছেন মহান আল্লাহ তায়ালা।নিশ্চয়ই আল্লাহ তার জ্ঞান ভান্ডার থেকে যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। অতএব দিনদিন বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা প্রমাণ করছে আল্লাহ সত্য, কুরআন সত্য, নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) সত্য নবী। সুবহানাল্লাহ!

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

"তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত কেউই তাঁর জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ত করতে পারেনা। তাঁর 'কুরসি' আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত এবং উভয়ের রক্ষনাবেক্ষন তাকে ক্লান্ত করে না, আর তিনি অতি মহান, শ্রেষ্ঠ।"
[সুরা বাকারা - ২৫৫]

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ আল কুরআনের উক্ত আয়াত - ই যথেষ্ট।

মানবজীবনে রয়েছে বিজ্ঞানের অনস্বীকার্য অবদান। অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা, মহাকাশের নানা রহস্যঘেরা সৃষ্টি সবই মানুষ জানতে পেরেছে বিজ্ঞানের সাহায্যে। দৈনন্দিন জীবনের সবকিছুতেই রয়েছে বিজ্ঞানের ছোঁয়া । ফলে মানুষের চিন্তা-ভাবনা হয়ে গেছে বিজ্ঞান কেন্দ্রিক। বিজ্ঞান যেটা সত্য ও বিদ্যমান বলে অনুমোদন দেয়; সেটাই সত্য আর অস্তিত্বসম্পন্ন আর বিজ্ঞান যেটার অনুমোদন না দেয়; সেটা সত্য নয় আর তার অস্তিত্বও নেই। এটাই এখন বেশির ভাগ মানুষের কাছে অলঙ্ঘনীয় সিদ্ধান্ত। ফলে তারা অন্যান্য বিষয়ের মতো আল্লাহকেও বিজ্ঞান দ্বারা প্রমানিত দেখতে চায়। অর্থাৎ বিজ্ঞান যদি আল্লাহকে আবিষ্কার করতে পারে; তবে আল্লাহ সত্য। আর যদি আল্লাহ বিজ্ঞান দ্বারা প্রমানিত না হন তাহলে আসলে আল্লাহর কোনো অস্তিত্ব নেই,নাউযুবিল্লাহ! এসব আল্ট্রামর্ডান লোকেরা নিজেদেরকে সংশয়বাদী বা নাস্তিক বলে আখ্যায়িত করে। আল্লাহর অস্তিত্ব বিষয়ে তাদের কমন প্রশ্ন হলো- "স্রষ্টা যদি থেকেই থাকেন তাহলে কি তিনি বিজ্ঞান দ্বারা প্রমানিত?" অর্থাৎ "স্রষ্টা কি বিজ্ঞান দ্বারা আবিষ্কারযোগ্য? এই প্রশ্নটি যারা করে থাকেন তারা নিজেদেরকে সাধারণ মানুষের থেকে উচ্চ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষ মনে করেন। তবে এর মাধ্যমে তারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতার যে পরিচয় দিচ্ছেন তা তাদের কাছে সহজেই অনুমের হয়না। তাদের প্রশ্নটি হলো-
"স্রষ্টা কি বিজ্ঞান দ্বারা প্রমানিত বা আবিষ্কার যোগ্য?

এই কনসেপ্টটি বোঝার জন্য আমাদের দুটি বিষয়ে ধারনা নিতে হবে। আর এই দুটি বিষয় হলো: আবিষ্কার এবং প্রমান। আবিষ্কার আর প্রমাণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রমাণ বলতে কোনো বস্তু বা বিষয়ের উপযুক্ত তথ্য ও যথাযথ যুক্তি দ্বারা তার সত্যতা প্রতিষ্ঠার নাম 'প্রমাণ"। আর আবিষ্কার হলো কোনো বস্তুকে যথাযথ তথ্য প্রমান সজ্ঞানে খুঁজে বের করে দৃশ্যমান বা অস্তিত্বমান হিসেবে প্রমাণিত করা যা ইতোপূর্বে মানুষের দৃষ্টিতে অদৃশ্য ছিল। তবে কিছু কিছু বস্তুর অস্তিত্ব প্রমানের জন্য তার দৃশ্যমান হওয়াটা আবশ্যক নয়। সেক্ষেত্রে আমরা তাকে অনুভবের মাধ্যমে তার উপস্থিতি নিশ্চিত করি। যেমন- কিছু গ্যাস আর বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ইত্যাদি। ফলে নাস্তিকদের ছোড়া প্রশ্নের উত্তর হলোঃ

আল্লাহ তায়ালা এই মহাবিশ্বে ও পৃথিবীর প্রকৃতির সর্বত্রই তাঁর উপস্থিতি ও অস্তিত্বের প্রমান রেখেছেন তাঁরই সৃষ্ট সব উপাদানে। কিন্তু তিনি তাঁকে আবিষ্কারের সক্ষমতা দেননি মানবজাতিকে। এটা মানবজাতির জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। আর এটা মানবজাতির জন্য পরীক্ষাও বটে। আর পরীক্ষাটি হলো- স্রষ্টার নিদর্শন সমূহকে উপলব্ধি করে স্রষ্টার অনন্য ক্ষমতাকে উপলব্ধির মাধ্যমে স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য।

কিছু কিছু আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট কিছু রুলস আছে। আমরা কোনো বস্তুর উপস্থিতি বুঝতে পারি স্পর্শ করে, স্বাদ গ্রহণ করে, দৃষ্টি দ্বারা, ঘ্রাণ নিয়ে এবং আমাদের কান দ্বারা শ্রবণ করে। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের যেকোনো একটি দ্বারা কোনো কিছুর অস্তিত্বকে আমরা বুঝতে পারি।সেই হিসেবে নাস্তিক তথা সংশয়বাদীদের যুক্তি হলো-এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারা স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমান হলেই বিশ্বাস করা যাবে স্রষ্টা আছে। তাহলে যদি এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারা আল্লাহকে প্রমানিত করা না যায় তাহলে কি তাঁর অস্তিত্ব নেই? এমন অনেক জিনিসের অস্তিত্ব আছে যেটা পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা প্রমানিত করা সম্ভব নয়। যেমন-অনুভূতি ভালোবাসা, বুদ্ধিমত্তা, রাগ, যুক্তি, শক্তি, কষ্ট, মন, আবেগ ইত্যাদি। অনুভূতিকে কি কখনো দেখা যায়? বুদ্ধিমত্তাকে কি কখনো স্পর্শ করা যায়? ভালোবাসার কি কোনো স্বাদ গ্রহণ করা যায়? শক্তির কি কখনো ঘ্রাণ নেয়া যায়? মনের কোনো শব্দ কি কখনো শোনা গেছে? 'না', তার কোনাটাই কখনোই হয় নি। ফলে এসব কিছু পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা প্রমানিত নয়।তাই বলে কি এগুলোর অস্তিত্ব নেই? অবশ্যই আছে।

কিন্তু এগুলোর অস্তিত্ব নির্ণয়ে বিজ্ঞানের রুলস একদম ফেইল।সুতরাং নাস্তিকদের এই তথাকথিত সাদামাটা বিজ্ঞান দিয়ে মহান আল্লাহকে খুঁজে পাওয়া বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। নাস্তিক বা সংশয়বাদীদের ব্যাপারটা এরকম যে, কেউ সাগরের কিনারায় দাঁড়িয়ে একটি বুদবুদের মধ্যে পুরো সাগর খুঁজে হয়রান হচ্ছে এবং পাচ্ছেনা বলে পুরো সাগরকেই অস্বীকার করছে। আর যুক্তি দাঁড় করাচ্ছে বুদবুদের মধ্যে পানির অস্তিত্ব কই?!

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন-

''দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পেতে পারে না, অবশ্যই তিনি দৃষ্টিসমূহ পেতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ।"

[সূরা আন-আম: ১০৩]

বাতাস (air) তো দেখা যায় না তাই বলে কি নাস্তিকরা বাতাসকে বিশ্বাস করে না? শব্দ (sound) তো দেখা যায় না তাই বলে কি তারা শব্দের অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না? তাহলে কোন যুক্তিতে বলে যে, আল্লাহকে দেখতে পায়না তাই আল্লাহকে বিশ্বাস করি না?

আল্লাহ তায়ালা প্রকৃতির কোনো নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ নন। তিনি সকল নিয়মের উদ্ভাবক। তাই প্রকৃতির এসব ধরাবাঁধা নিয়মে তাঁকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। আর বিজ্ঞানের দাবি মহাবিশ্বের মাত্র ৪% বিজ্ঞানের জানা বাকি ৯৬% বিজ্ঞানের কাছে অজানা। তাহলে এই অসম্পূর্ণ জ্ঞানে জ্ঞানী বিজ্ঞানীদের স্বয়ংসম্পূর্ণ পরাক্রমশালী মহান আল্লাহকে আবিষ্কার করার সক্ষমতা কতটুকু তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।আল্লাহকে আবিষ্কার করা যায়নি তাই স্রষ্টা বলতে আসলে কিছুই নেই - এটি একটি ভিত্তিহীন কথাবার্তা। আল্লাহকে আবিষ্কার করতে না পারা এটা বিজ্ঞানের অক্ষমতা। আর বিজ্ঞানের এই অক্ষমতা চিরকাল রয়েই যাবে।

মহাবিশ্বে বিদ্যমান হাজার হাজার কোটি নক্ষত্র, গ্যালাক্সি সুনিপুনভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এসব এমনি এমনি পরিচালিত হচ্ছেনা। বরং আল্লাহ তায়ালা এসব পরিচালিত করছেন। তাহলে আমাদের যে কমন সেন্স সে সেন্স থেকে যেকেউ নির্দ্বিধায় বলতে পারি মহাবিশ্বের এই প্ল্যানিং ও সিস্টেমই হলো একজন স্রষ্টার যথাযথ প্রমান। নাস্তিক তথা সংশয়বাদীরা খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলা হাজার বছরের

ব্যবধানে মহাবিশ্বের মাত্র ৪% জানা সাদামাদা বিজ্ঞান দিয়ে এসব কিছুর পালনকর্তা, মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালাকে প্রমাণিত দেখতে চায়। বাহ! নাস্তিকদের দুঃসাহসের তারিফ করা যায় বটে। তবে তারিফের ক্ষেত্রে তাদেরকে একেবারে নিরেট নির্বোধ বলা ছাড়া অন্য কোনো বিশ্লেষণে বিশেষায়িত করার কোনো পথ খোলা নেই। ফলে আল্লাহকে বিজ্ঞান দ্বারা প্রমানিত দেখতে না পেলেও এর মানে এই না যে তিনি নেই। বরং তিনি আছেন এবং তিনি সবকিছুতেই বিরাজমান। এরপরেও কি কেউ স্রষ্টায় অবিশ্বাসী হতে পারে!

কোন এক বেদুঈনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: 'আল্লাহ যে আছে তার প্রমাণ কি?' সে উত্তরে বলেছিল: 'সুবহানাল্লাহ! উটের বিষ্ঠা দেখে উট আছে এর প্রমাণ পাওয়া যায়, পায়ের চিহ্ন দেখে পথিকের পথ চলার প্রমাণ পাওয়া যায়; তাহলে এই যে বড় বড় নক্ষত্র বিশিষ্ট আকাশ, বহু পথ বিশিষ্ট যমীন, বড় বড় ঢেউ বিশিষ্ট সমুদ্র কি সেই মহাজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়না? (আর রাযী ২/৯১)

আবূ নুয়াস (রহঃ) এই জিজ্ঞাস্য বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেন: 'আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া ও তা হতে বৃক্ষরাজি সৃষ্টি হওয়া এবং তরতাজা শাখার উপর সুস্বাদু ফলের অবস্থান আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব এবং তাঁর একাত্মবাদের দলীল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। ইব্‌ন মুআয (রহঃ) বলেন: 'আফসোস! আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা এবং তাঁর সত্ত্বাকে অবিশ্বাস করার উপর মানুষ কি করে সাহসিকতা দেখাচ্ছে অথচ প্রত্যেক জিনিসই সেই বিশ্বরবের অস্তিত্ব এবং তাঁর অংশীবিহীন হওয়ার উপর সাক্ষ্য প্রদান করছে!' অতএব যারা আকাশের দিকে তাকিয়ে উহার বিশালতা, প্রশস্ততা এবং বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে, যার কিছু স্থির এবং কিছু চলনশীল, যারা সমুদ্রের প্রতি লক্ষ্য করে যার উভয় দিক ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত, যার পাহাড়সমূহ ভূমিকে স্থির রাখার জন্য মাটিতে প্রোথিত তাদের জন্য এতে রয়েছে উপদেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَ مِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيْضٌ وَ حُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَ غَرَابِيبُ سُودٌ. وَ مِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَ الْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَموا

পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের ফল শুভ্র, লাল ও নিকষ কালো। এভাবে রং বেরংয়ের মানুষ, জানোয়ার ও চতুস্পদ জন্তু রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে।
[সূরা ফাতির:২৭-২৮]

অন্যান্য বিজ্ঞজনের বাক্য হচ্ছে: 'তোমরা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর, ওর উচ্চতা, প্রশস্ততা, ওর ছোট বড় উজ্জ্বল তারকারাজির প্রতি লক্ষ্য কর, ওগুলির ঔজ্জ্বল্য ও জাঁকজমক, ওদের আবর্তন ও স্থিরতা এবং ওদের প্রকাশ পাওয়া ও গোপন হওয়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। অতঃপর সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখ যার ঢেউ খেলতে রয়েছে ও পৃথিবীকে ঘিরে আছে। তারপর উঁচু নীচু পাহাড়গুলির দিকে দেখ যা যমীনের বুকে প্রোথিত রয়েছে এবং ওকে নড়তে দেয়না, ওদের রং ও আকৃতি বিভিন্ন। বিভিন্ন প্রকারের সৃষ্ট বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, আবার ক্ষেত ও বাগানসমূহকে সবুজ সজীবকারী প্রবাহমান সুদৃশ্য নদীগুলির দিকে তাকাও, ক্ষেত ও বাগানের সবজীগুলি এবং ওদের নানা প্রকার ফল, ফুল এবং সুস্বাদু মেওয়াগুলির কথা চিন্তা কর যে, মাটিও এক এবং পানিও এক, কিন্তু আকৃতি, গন্ধ, রং, স্বাদ এবং উপকার দান পৃথক পৃথক। এসব কারিগরী কি তোমাদেরকে বলে দেয়না যে, ওদের একজন কারিগর আছেন? এসব আবিষ্কৃত জিনিস কি উচ্চরবে বলেনা যে, ওদের আবিষ্কারক কোন একজন আছেন? এ সমুদয় সৃষ্টজীব কি স্বীয় সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, তাঁর সত্ত্বা ও একাত্মবাদের সাক্ষ্য প্রদান করেনা? এ হচ্ছে দলীল যা মহা সম্মানিত ও মহা মর্যাদাবান আল্লাহ স্বীয় সত্ত্বাকে স্বীকার করার জন্য প্রত্যেক চক্ষুর সামনে রেখে দিয়েছেন যা তাঁর ব্যাপক ক্ষমতা, পূর্ণ নৈপুণ্য, অদ্বিতীয় রহমত, অতুলনীয় দান এবং অফুরন্ত অনুগ্রহের উপর সাক্ষ্য দান করার জন্য যথেষ্ট। আমরা স্বীকার করছি যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন পালনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা এবং রক্ষাকর্তা নেই। তিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্যও নেই এবং নিঃসন্দেহে তিনি ছাড়া সাজদাহর হকদারও আর কেউ নেই।

মহাবিশ্বের সৃষ্টি - বিগব্যাং তত্ত্ব

আল্লাহ তায়ালার কোনোকিছু সৃষ্টির জন্য পূর্বপ্রস্তুতির কোনো প্রেয়োজন নেই। আল - কুরআনে তিনি বলেন,

"তিনি আকাশমন্ডলী ও জমিনকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী; তিনি যখন কোনোকিছু করতে চান তখন বলেন," হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়।"
[সূরা বাকারাহ: আয়াত ১১৭]

শুধুমাত্র এই একটি আয়াতই মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে একজন স্রষ্টার ভূমিকা নিশ্চিত করে।

বিজ্ঞানের আলোকে সহাবিশ্বের সৃষ্টি প্রক্রিয়াটিকে বিজ্ঞানীরা ''বিগব্যাং তত্ত্ব'' নাম দিয়েছেন। বিগব্যাং তত্বটি হলোঃ বিগব্যাং বিষ্ফোরণ পূর্ববর্তী ক্ষুদ্র বিন্দু হটাৎ মহাবিস্ফোরণ থেকে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি। অর্থাৎ বর্তমান বিশ্বের সকল উপাদান একটি সূক্ষ্ম বিন্দুতে অসীম ঘনত্বে বিরাজমান ছিল। বিগব্যাং বিস্ফোরণের পর সবকিছু মহাবিশ্বে ঘড়িয়ে যায়। আর এভাবেই সকল গ্রহ,নক্ষত্র, গ্যালাক্সি ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে। এসব বিষয়ে বিজ্ঞান সবেমাত্র অবগত হয়েছে।

মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

"অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখেনা যে, আকাশ ও পৃথিবী ওতোপ্রোত ভাবে মিশেছিল, অতঃপর আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম এবং প্রানবন্ত সবকিছুকেই সৃষ্টি করলাম পানি থেকে। তবুও কি তারা ইমান আনবে না?"
[সূরা আম্বিয়া: আয়াত ৩০]

সুতরাং এই আয়াত থেকে এটা সুসস্পষ্ট যে, এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা হলেন মহান আল্লাহ তায়ালা। প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বেই মহান আল্লাহ মানুষকে সেটা জানিয়েছেন। কিন্তু আনুষ তার জ্ঞানের অপরিপক্কতার কারনে তা অনুধাবন করা থেকে বিরত

থেকেছে। ফলে এতো বছর পরে এসে বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার দেখে বিস্ময়বোধ করছে। বিজ্ঞান নিজের অজান্তেই কুরআনের সত্যতা মানুষের সামনে তুলে ধরছে।

কুরআনের বক্তব্য কত সুস্পষ্ট ও কত নিখুঁত! যা কিনা বিজ্ঞানের সাথে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নক্ষত্র-গ্রহ-উপগ্রহ নিজ নিজ কক্ষপথে ঘোরে

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

"তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।"

[সুরা আম্বিয়া: ৩৩]

এখানে সবাই বলতে শুধু সূর্য ও চন্দ্রকে বোঝাননি। যদি তাই হতো তাহলে আল্লাহ 'সবাই' শব্দটি না বলে 'তারা' শব্দটি উল্লেখ করতেন। সুতরাং এখানে সবাই বলতে মহাবিশ্বের সবকিছুই আবর্তনশীল।সূর্য একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র; এর নিজস্ব আলো রয়েছে। সূর্য যে স্থির নয় এই বিষয়টিও পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়া'লা ঘোষণা করেন,

"সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে।"

[সুরা ইয়াসিন: ৩৮]

এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তায়ালা দুইটি বিষয় সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। প্রথমত; সূর্য স্থির নয় এবং আবর্তনশীল। দ্বিতীয়ত; সূর্য এই মহাবিশ্বের যত্রতত্র আবর্তন করছে না, বরং তার জন্য নির্দিষ্ট যে এরিয়া নির্ধারন করে দেয়া হয়েছে সে শুধুমাত্র সেখানেই বিচরণ করতে পারে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ তথ্য অনুযায়ী সূর্য মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে "সোলার এপেক্স" নামের একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথ ধরে ঘন্টায় ৭ লক্ষ ২০ হাজার কিলোমিটার বেগে "VEGA" নামের নক্ষত্রের দিকে প্রচন্ড গতিতে ধাবমান রয়েছে। আর এই "VEGA" নামীয় নক্ষত্রটি আমাদের পৃথিবী হতে ২৫ আলোকবর্ষের মতো এক সুদীর্ঘ দূরত্বে অবস্থান করছে। সুতরাং সূর্য প্রতিদিন

প্রায় ১ কোটি ৭২ লক্ষ ৮০ হাজার পথ অতিক্রম করে তার জন্য নির্ধারিত কক্ষপথে।সূর্য কিন্তু এককভাবে এইপথ পাড়ি দিচ্ছে তা নয় বরং পুরো সৌরজগতকে সাথে নিয়েই এই পথ পাড়ি দিচ্ছে। সূর্যের সাথে মহাকর্ষ বলে আবদ্ধ থাকা বিভিন্ন গ্রহ এবং বিভিন্ন গ্রহের উপগ্রহ সূর্যের সাথে অভিকর্ষ বলে আবদ্ধ থাকার ফলে সূর্য যেখানে যাচ্ছে সূর্য কেন্দ্রিক এই সৌর পরিবারও সূর্যের সাথে ছুটে চলেছে। আমাদের চাঁদকে বলা হয় মহাজাগতিক বিন্দু। সুতরাং দেখা যাচ্ছে চাঁদের মতো মহাজাগতিক বিন্দু থেকে শুরু করে সুপার ক্লাস্টারের মতো সিন্ধু পর্যন্ত যার যার নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তন করছে । সুতরাং এই পুরো মহাবিশ্বই অসংখ্য কক্ষপথে পরিপূর্ণ।আর আল্লাহ তায়ালাও এই বিষয়টি সুস্পষ্ট করে মানবজাতিকে অবগত করে পবিত্র কুরআনে বলেন,

"শপথ বহুপথ আর কক্ষপথ বিশিষ্ট আসমানের।''

[সুরা সারিয়াত: ৭]

মহাকাশের ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন গ্রহ নক্ষত্রের কোনোটির একটি অপরটি কক্ষপথে চলে যায় না। কারো সাথে কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না। আমাদের পৃথিবী যদি তার কক্ষপথ থেকে ২.৫ মি.মি. দূরে সরে যায় তাহলে পুরো পৃথিবী বরফে ঢেকে যাবে। আর যদি ৩.১ মি.মি. বিচ্যুত হয় তাহলে আমরা সবাই মারা যাবো। শুধু পৃথিবী নয় অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ -নক্ষত্র প্রভৃতি যদি তার নিজ কক্ষপথ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয় তাহলে পুরো মহাবিশ্বে ধ্বংসযজ্ঞের তাণ্ডব শুরু হয়ে যাবে।

সুতরাং এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা মহান আল্লাহ ভায়ালা সবকিছুকে কত সুনিপুনভাবে পরিচালনা করছেন। প্রায় ১৪০০ বছর আগের সময়ে যখন মানুষ ছিল জাহিলিয়্যাতে নিমজ্জিত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো ছোয়াই ছিলনা; ছিলনা কোনো টেলিস্কোপ। তাহলে নবী (সা.) মহাকাশবিজ্ঞানের এসব জ্ঞান কোথা থেকে আহরণ করলেন?সুতরাং এ থেকে এটা স্পষ্ট যে মহাবিশ্বের যিনি স্রষ্টা - সেই মহাসর্বশক্তিমান আল্লাহ ই তাঁকে এসবকিছু পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে জানিয়েছেন।

সূর্যের আলো উৎপাদন প্রক্রিয়া

সূর্য ব্যতীত এই বিশাল সৌরজগতের অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। আবার আমরা ও আমাদের প্রকৃতি, আমাদের পৃথিবীসহ সৌরজগতের অনান্য গ্রহ ও উপগ্রহ, পাথরের কল্পনাতীত বিশাল বেল্টসমূহসহ সবকিছুর অস্তিত্বে বিদ্যমান থাকতে সূর্যের আলো সবচেয়ে বেশি দরকার।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,
"তিনিই সে মহান স্রষ্টা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে উজ্জল আলোকময় আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরনকারী রূপে; অতঃপর নির্ধারিত করেছেন এর জন্য নির্ধারিত মনজিলসমূহ যাতে করে তোমরা গননা করতে পারো বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব।আল্লাহ যথার্থতা ব্যতিত সবকিছু এমনিতেই সৃষ্টি করেননি তিনি প্রকাশ করেন নিদর্শনসমূহ সে সমস্ত লোকের জন্য যাদের জ্ঞান আছে।"

[সুরা ইউনুস: ০৫]

উল্লিখিত আয়াতের আলোকে জনা যায় আল্লাহ সূর্যকে আলোকময় করে বানিয়েছেন। অর্থাৎ এর আলো নিভে না। সুতরাং আল্লাহর পরিচালনায় সূর্য বিরতিহীন আলো উৎপাদন করে চলেছে।

এবার বিজ্ঞানের আলোকে এর যথার্থতা ব্যাখ্যা করা যাক।

সূর্য মূলত নিউক্লিয়ার ফিউশন প্রক্রিয়ায় শক্তি লাভ করে। সূর্যে প্রতি সেকেন্ডে ৬০ কোটি টন শক্তি ভরশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রা প্রায় ১৫ মিলিয়ন বা ১.৫ কোটি ডিগ্রী সেলসিয়াস যা ফিউশন বিক্রিয়া অব্যাহত রাখে। সূর্যের মূল উপাদান হলো হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস। যা সূর্য জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে বিপুল শক্তি উৎপাদন করে। আর এই শক্তিই সূর্যের আলোর মূল উৎস। এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে বলা নিউক্লিয়াস ফিউশন। আর এভাবেই বিগত সাড়ে চারশো কোটি বছর ধরে অনবরত সূর্য প্রজ্জল্যমান রয়েছে।

সূর্যের শেষ পরিণতি

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

"আর সূর্য ভ্রমন করে এর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।"

[সুরা ইয়াসীন: ৩৮]

জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণা লব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় সূর্য 'VEGA' নামের একটি নক্ষত্রের দিকে প্রচন্ড গতিতে ধাবমান রয়েছে। অর্থাৎ VEGA নামীয় নক্ষত্রের দিকে সূর্য প্রতিনিয়ত পরিক্রমণ করে চলেছে।

সূর্যের বয়স প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছর। সূর্য এখন মধ্য বয়সের। অর্থাৎ সূর্য আরও সাড়ে চারশো কোটি বছর মহাকাশে থাকবে। একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া বা পৃথিবীর ধ্বংস শুরু হতে সূর্যকে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হতে হবে, এমনটা নয়। সূর্যের তাপমাত্রার কিছুটা তাপমাত্রাই যথেষ্ট পৃথিবী পুড়ে ছাই হতে। সূর্যের বর্তমান অপমাত্রার চেয়ে মাত্র ৩ গুন বৃদ্ধি পেলেই পৃথিবী পৃষ্ট থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাপমাত্রা ১০ গুণ বৃদ্ধি পেলেই পৃথিবী পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এভাবে সূর্য তার জীবনের শেষ পর্যায়ে যাওয়ার বহুপূর্বেই আমাদের পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। পরিশেষে একসময় যখন তার অন্তিম সময়ে চলে আসবে তখন এটি তার পরিধি বৃদ্ধি করতে থাকবে আর আকারে এতো বড় হবে যে তা বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথকেও ছাড়িয়ে যাবে। এরপরে একটা সময় সূর্য সুপার নোভা বিস্ফোরণ করে তার পৃষ্ঠ দেশের আবরণকে উড়িয়ে দিয়ে জীবনলীলা সাঙ্গ করবে। আর সূর্যের এই জীবন বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন মহা মহীয়ান আল্লাহ। সূর্যের এই পরিনতির কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন,

"যখন সূর্য আলোকহীন হয়ে যাবে"

[সুরা তাকভীর: ১]

সুতরাং এখন হতে প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে সূর্যের অন্তীম সময়ের যে কথা আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন তা আজ অবলীলায় বিজ্ঞান প্রমাণিত করে পবিত্র কুরআনের অলৌকিকতা বিশ্ব দরবারে তুলে ধরছে বিজ্ঞান তার নিজেরই অজান্তে।

ব্ল্যাকহোল - নক্ষত্র পতনের স্থান

চিন্তাশীল ও জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই গভীরভাবে অনুধাবন করেন আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টি জগতে এত এত বস্তু থাকতে কেনো তিনি তার বানীর বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ কিছু বস্তু বা বিষয় নিয়ে শপথ করেছেন। নিশ্চয়ই এর মাঝে রয়েছে মহান আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কোনো রহস্য বা সুপ্ত নিদর্শন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

""আমি শপথ করছি নক্ষত্রসমূহ পতন স্থানের।'

[সুরা ওয়াকিয়া: ৭৫]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা "নক্ষত্রসমূহ পতনের স্থানের' কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ যে স্থানে নক্ষত্রসমূহ পতিত হয়। আর এই স্থানই হলো সেই স্থান যাকে আধুনিক বিজ্ঞানীগন 'ব্ল্যাকহোল' নামে আবিষ্কার করেছেন। "ব্ল্যাকহোল" শব্দের অর্থ হলো কালো গর্ত। একে এই নামকরণ করার পেছনে কারণ হলো, এটি এর নিজের দিকে আসা সকল আলোক রশ্মিকে শুষে নেই। ১৯১৭ সালে "ইভেন্ট ইরাইজন" টেলিস্কোপ দ্বারা 'মেসিয়ে ৮৭' ছায়াপথের কেন্দ্রে অবস্থিত অতি ভারি "ব্ল্যাকহোল" পর্যবেক্ষণের পর দীর্ঘ বিশ্লেষনের শেষে ১০ই এপ্রিল ২০১৯ সালে প্রথমবারের মতো একটি কৃষ্ণ গহ্বর বা ব্ল্যাকহোল ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তথ্যচিত্র প্রকাশ করে। ব্ল্যাকহোলের গ্রাভিটি বা আকর্ষণ বল এতো তীব্র যে তার কাছ থেকে আলোও পালাতে পারে না। এই ব্ল্যাকহোল ই হলো বর্তমান বিজ্ঞানের তথ্য অনুসারে মহান আল্লাহর শপথকৃত নক্ষত্র পতনের স্থান। ব্ল্যাকহোলের গ্রাসে অনবরত ধরা পড়া সব নক্ষত্রদের করুণ দশার কারণে এর চতুর্দিকে আলোর চাকতি সৃষ্টি হয়। ব্ল্যাকহোল প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রকে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠিয়ে দেয়। একটি ব্ল্যাকহোলের ব্যাসার্ধ হতে পারে হাজার হাজার কোটি কিলোমিটার। শুধুমাত্র আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যাল্যাক্সির অন্ধকার অলিতেগলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক কোটিরও বেশি 'ব্ল্যাকহোল"।মহাকাশে নক্ষত্রদের পতনের জন্য "ব্ল্যাকহোল"

ব্যতীত অন্য কোনো জায়গা নেই। সুতরাং, মহাকাশবিজ্ঞান অনেক গবেষণার পর বর্তমানে "ব্ল্যাকহোল" নামের যে "নক্ষত্রসমূহ পতনের স্থানের" কথা জানিয়েছে, এটিই সুমহান আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত এবং শপথকৃত সেই" নক্ষত্রসমূহ পতনের স্থান"।

তাহলে দেখা যাচ্ছে- আধুনিক বিজ্ঞান সুদীর্ঘ সময় ধরে হাজারো পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে যে তথ্যগুলো আজ উপস্থাপন করছে পবিত্র আল কুরআন অলৌকিকভাবে দেড় হাজার বছর আগেই তা ঘোষণা করেছে।

মহাবিশ্বের বিশালতা

মানুষের পক্ষে মহাবিশ্বের পরিধির ব্যাপারে সু-স্পষ্ট ধারণা লাভ করা কখনই সম্ভব নয়। কারণ মহাবিশ্বের বিশালতা কল্পনাতীত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

''হে জিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পারো অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা অতিক্রম করতে পারবেনা সনদব্যতিরেকে।"

[সুরা রহমান: ৩৩]

অর্থাৎ মানুষ ও জিন সম্প্রদায়ের সেই নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রমের সামর্থ্য তো নেই বরং আল্লাহ কর্তৃক সেটার অনুমতিও দেয়া হয়নি। এখন অনেকে মনে করতে পারেন যে বিজ্ঞানীরা তো পৃথিবীর সিমানা পেরিয়ে মহাকাশে বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি ইত্যাদি আবিষ্কার করেছে। তাহলে তো বিজ্ঞানীরা সেই সীমানা অতিক্রম করে ফেলেছে! যারা এমনটা মনে করেন তাদের এটা জেনে রাখা প্রয়োজন যে বিজ্ঞানীরা যেটাকে মহাকাশ বলছে এটা মূলত কোনো আকাশ নয়।আকাশ মোট সাতটি। প্রথম আকাশ, এরপর দ্বিতীয় আকাশ এরপর তৃতীয় এভাবে সাতটি আকাশ । বিজ্ঞানীরা যেটা আবিষ্কার করেছে তা প্রথম আকাশ তো নয়ই বরং তার নিচের ফাঁকা স্থান যেখানে এসব নক্ষত্র,গ্রহ,উপগ্রহ ইত্যাদি বিদ্যমান। একে বলা হয় মহাশূন্য।

বিজ্ঞানীরা আরো জানিয়েছে তারা মহাবিশ্বের মাত্র ৪% জানতে পেরেছে বাকি ৯৬% ই তাদের অজানা। আর এটুকু জানতে পেরেছে কারণ আল্লাই চেয়েছেন। আল্লাহ না চাইলে তারা এটুকু ও আবিষ্কার করতে সক্ষম হতো না। অর্থাৎ আল্লাহর বানী সত্য - আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর এক নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্তই মানুষ ও জিন যেতে সক্ষম। এর চেয়ে বেশি সীমা অতিক্রমের সক্ষমতা জিন ও মানব সম্প্রদায়ের নেই। আমাদের পৃথিবী সূর্য নামের একটি নক্ষত্রের আওতাধীন একটি ক্ষুদ্র গ্রহ মাত্র। আমাদের সূর্যের চেয়ে ছোট-বড় বিলিয়ন বিলিয়ন নক্ষত্র রয়েছে এই "মহাবিশ্বে"। এই মহাবিশ্বে নক্ষত্ররা গুচ্ছ গুচ্ছ অংশে বিভক্ত হয়ে দলবদ্ধ অবস্থায় থাকে। এই গুচ্ছকে বলা হয় ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি। বিজ্ঞানীরা এই গ্যালাক্সিকে স্টার সিটি

বলেও অভিহিত করে থাকেন। আমাদের সূর্য বা আমরা যে গ্যালাক্সিতে থাকি তার নাম 'মিল্কিওয়ে" সেখানে রয়েছে আমাদের সূর্যের মতো আরো প্রায় ৪০ হাজার কোটি নক্ষত্র। এই গ্যালাক্সির ব্যাস হচ্ছে ১ লক্ষ আলোক বর্ষ। আলোর গতিতে ছুটে গেলে অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিলেও আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির এ প্রান্ত হতে ও প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছুতে সময় লাগবে ১ লক্ষ বছর। তাহলে এবার চিন্তা করার বিষয় আমাদের গ্যালাক্সির বিশালতার যদি এই অবস্থা হয় তাহলে এই মহাবিশ্বের বিশালতা কেমন হতে পারে? নক্ষত্রদের যেমন গুচ্ছ বা দলবদ্ধ অবস্থা রয়েছে তেমনি গ্যালাক্সি বা ছায়াপথেরও গুচ্ছ বা দলবদ্ধ অবস্থা রয়েছে, এই গ্যালাক্সি গুচ্ছকে বলা হয় লোকাল গ্যালাটিক গ্রুপ। এখানে স্থিত আমাদের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী গ্যালাক্সির নাম "এন্ড্রোমিডা" গ্যালাক্সি। যেটি আমাদের কাছ থেকে ২৬ লক্ষ ৫০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করছে। অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার গতিতে গেলেও আমাদের সময় লাগবে সাড়ে ২৬ লক্ষ বছর। তাহলে বাকি গ্যালাক্সি গুলোর দূরত্বই বা কেমন হবে? আর আমাদের মহাবিশ্বই বা কত বড় কল্পনা করা যায়? আবার অল্প অল্প গ্যালাক্সিদের গুচ্ছ সংগঠন গ্যালাটিক গ্রুপ গুলোও এক জায়গায় অনেক গ্যালাটিক গ্রুপ দলবদ্ধ অবস্থায় থাকে। এই গ্যালাটিক গ্রুপের গুচ্ছ গ্রুপকে বলা হয় সুপার ক্লাস্টার। আমরা যে সুপার ক্লাস্টারে বাস করি তার নাম "লানাইকিয়া" সুপার ক্লাস্টার। এক হতে প্রায় দেড় লক্ষ গ্যালাক্সির এক বিশাল সংগঠন এই "লানাইকিয়া" সুপার ক্লাস্টারটি। যেখানে এক আলোকবর্ষের দূরত্ব হচ্ছে ৯৫ হাজার কোটি কিলোমিটার। আর আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ব্যাসই হচ্ছে ১লক্ষ আলোকবর্ষ। সেখানে এই "লানাইকিয়া সুপার ক্লাস্টারের ব্যাস হচ্ছে ৫৫ কোটি আলোকবর্ষ। আর "লানাইকিয়া" সুপার ক্লাস্টারের তুলনায় আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি একটি সুইয়ের অগ্রভাগ আকারেরও নয়। আর এরকম বিলিয়ন বিলিয়ন সুপার ক্লাস্টার রয়েছে এই মহাবিশ্বে। তাহলে আসলেই এই মহাবিশ্ব কত বড়! সর্বশেষ মহাকাশ গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞানীরা সুদীর্ঘ গবেষণার পর জানিয়েছেন, এই পর্যন্ত তারা মহাবিশ্বের ব্যাস ৯৩.১৬ বিলিয়ন আলোক বর্ষ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পেরেছেন। মানে প্রায় ৯৩ শত কোটি আলোকবর্ষ।

এবার যদি আমরা এই বিশাল মহাবিশ্ব থেকে ধীরে ধীরে আমাদের পৃথিবী পর্যন্ত যাই তবে এই মহাবিশ্বের বিশালতার বিষয়টি আরো ভালো করে উপলব্ধি করতে পারবো বলে আশা করছি। এই বিশাল মহাবিশ্বের ক্ষুদ্র একটি সংগঠন হলো 'সুপার ক্লাস্টার' যা আবার অনেকগুলো গ্যালাটিক গ্রুপের স্বচ্ছ সংগঠন। আবার এই এক একটি গ্যালাটিক গ্রুপ হলো শত শত গ্যালাক্সির সংগঠন। সেখানে স্থিতে গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যেকার দূরত্বই মিলিয়ন মিলিয়ন আলোকবর্ষ। আর প্রতিটি গ্যালাক্সিই হলো বিলিয়ন বিলিয়ন নক্ষত্রদের বিশাল সংগঠন। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, সবগুলো গ্যালাক্সিই কিন্তু আকার বা আয়তনে সমান নয়। যেমন- আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিটি মুলত একটি ছোট আকারের গ্যালাক্সি যেটিতে রয়েছে প্রায় ৪০ হাজার কোটি নক্ষত্র। এই ৪০ হাজার কোটি নক্ষত্রের একটি হলো আমাদের সূর্য।আর এই সূর্য নামক নক্ষত্রের অধীনে আছে আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহ। মিল্কিওয়ের তুলনায় সূর্য কতটা ক্ষুদ্র তারও একটি অনুমান দিয়েছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। তারা বলেন- যদি মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিকে পুরো যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তুলনা করা হয় তবে সূর্য হচ্ছে একটি শ্বেত রক্তকণিকা । আর এই ক্ষুদ্র সূর্যের তুলনায় আমাদের পৃথিবী ১৩ লক্ষ গুণ ছোট। অর্থাৎ পৃথিবীর উপর থেকে আমাদেরকে আতশী কাঁচ দিয়ে খুঁজলেও আমাদের অস্তিত্ব ধরা পড়বে না। যে মহান প্রতিপালক এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন তিনিই বা তাহলে কত বড় ? আল্লাহু আকবার! আর এই বিশাল মহাবিশ্ব তথা আকাশের গুরুত্বকে গভীরভাবে ইঙ্গিত করে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন,

"শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মান করেছেন তাঁর।"

[সুর শামস: ০৫]

মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

"আমি আমার ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মান করেছি এবং নিশ্চয়ই আমি এর মহাসম্প্রসারণকারী।"
[সুরা যারিয়াত: ৪৭]
এখানে আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, তিনি নিজ ক্ষমতাবলে আকাশ তথা এই "মহাবিশ্ব" নির্মান করেছেন এবং তিনিই এর মহা সম্প্রসারণ ঘটিয়ে চলেছেন। এবার দেখা যাক বিজ্ঞান এ ব্যাপারে কি বলে -

সুদীর্ঘ সময়ের মহাকাশ গবেষণার সিদ্ধান্ত হলো প্রায় সাড়ে তেরো বিলিয়ন বছর পূর্বে "বিগব্যাং" নামক একটি মহাবিস্ফোরণ দ্বারা এই মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ শুরু হয়ে অদ্যবধি এর সম্প্রসারনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। অর্থাৎ এই মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হয়েই চলেছে।

প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী 'এডউইন হাবল' তার টেলিস্কোপ দ্বারা দেখতে পান, আকাশে স্থিত গ্যালাক্সিগুলো ক্রমশই একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং সবগুলো গ্যালাক্সির এই দূরে সরে যাওয়াটা প্রমান করে যে এই "মহাবিশ্ব ক্রমশই সম্প্রসারিত হয়েই চলেছে।

চাঁদের মনযিলসমূহ (Lunar Station)

চাঁদ তার কক্ষপথে অবস্থিত কতগুলো নির্দিষ্ট তারকাকে অতিক্রম করে ২৭ দিন ৩ ঘন্টা পরপর পৃথিবীকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। তাই চাঁদের কক্ষপথ (Lunar orbit) ২৭টি অক্ষাংশে বিভক্ত। এই অক্ষাংশ গুলোকেই বলা হয় Lunar station বা চাঁদের মনযিল । Lunar Station অতিক্রম করার সময় চাঁদকে ক্রমশ আকৃতিতে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে দেখা যায়। আর এর মাধ্যমেই আমরা তারিখ, মাস গণনা করি। দুটি অমাবস্যা (Two New moons) এবং দুটি পূর্ণিমার (Two Full moons) উপর ভিত্তি করে চন্দ্র মাস, বছর নির্ণয় করা হয়।

চাঁদের মনমিলসমূহ বা Lunar station সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন:

"চাঁদের জন্য মনযিলসমূহ নিরুপন করে রাখা হয়েছে যতক্ষন না সে পুরাতন খেজুর শাখার ন্যায় ক্ষীণ হয়ে ফিরে।"

[সুরা ইয়াসিন: ৩৯]

এখানে আল্লাহ "পুরাতন খেজুর শাখার ন্যায়" কথাটি উল্লেখ করেছেন। আমরা যখন নতুন চাঁদ উঠতে দেখি তখন তা একদম সরু হয়ে উঠতে দেখি। যা অনেকটাই "পুরাতন খেজুর শাখার ন্যায় দেখতে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ আরও বলেছেনঃ

"ওরা আপনাকে চাঁদের (হ্রাস-বৃদ্ধি) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলুন চাঁদ মানুষের জন্য সময় নির্দেশক।"

[সুরা বাকারা: ১৮৯]

পৃথিবীতে চাঁদ ও সূর্যের গুরুত্ব

পৃথিবী বর্তমানে যে অবস্থানে রয়েছে তার থেকে যদি কয়েক সেঃ মিঃ সূর্যের কাছাকাছি যেত তাহলে এ সুন্দর বসুন্ধরা জ্বলে-পুড়ে লাল হয়ে শুক্র গ্রহের (Venus) রূপ ধারণ করতো। এখানে জীবনের, উৎপত্তি কখনো সম্ভব হতো না। আর যদি পৃথিবী সূর্য থেকে ১% মাত্র দূরে সরে যেত তাহলে এটি মঙ্গল গ্রহের (Mars) মত চিরকালের জন্য তুষারাচ্ছন্ন হয়ে পড়তো।

পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদ (moon) যদি তার অবস্থান থেকে শতকরা কয়েক কিঃ মিঃ পৃথিবীর নিকটবর্তী হতো তাহলে নদী-সমুদ্রের পানিগুলি প্লাবিত হয়ে কিংবা Over flow হয়ে গোটা ভূ-পৃষ্ঠ বন্যার জলে নিমজ্জিত করে রাখতো। আর যদি চাঁদ কয়েক বিন্দু পৃথিবী থেকে দূরে সরে যেত তাহলে পৃথিবী মরুভূমিতে পরিণত হতো। পানি কোথাও পাওয়া যেত না।

পৃথিবীতে নদী সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটা ঘটে চাঁদের আকর্ষণে। চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে অবিরাম ঘুরছে। এ ঘূর্ণনের সময় পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের সম্মুখে পড়ে সেখানে চন্দ্রের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশী হয়। স্থলভাগ অপেক্ষা জল ভাগের উপর চাঁদের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশী বলে চারিদিক থেকে পানি ঐ আকর্ষণ স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে চন্দ্রের কাছাকাছি অংশের পানি ফুলে ওঠে এবং জোয়ার সৃষ্টি করে। এ জোয়ারকে মুখ্য জোয়ার বলে। আবার ঠিক ঐ সময়ে পৃথিবীর যে অংশে চন্দ্রের টানে মুখ্য জোয়ার ঘটে তার বিপরীত দিকের পানি অপেক্ষা পানির নীচের স্থলভাগ চন্দ্রের দিকে বেশী আকৃষ্ট হয়। এ সময় এই পানির উপর পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব কমে যায় এবং বিকর্ষণ শক্তির প্রভাবে চারিদিকের পানিরাশি সে স্থানে এসে জোয়ারের সৃষ্টি করে। এরূপ সৃষ্ট জোয়ারকে গৌণ জোয়ার বলে।

যখন পৃথিবীর কোন অংশে মুখ্য জোয়ার আসে তখন তার বিপরীত অংশে গৌণ জোয়ার হয়। সে সময় কিন্তু এ জোয়ারের মধ্যবর্তী দু'পাশের স্থান থেকে পানি সরে যায়। এ দু'স্থানে তখন ভাটা হয়। পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের কাছাকাছি আসে সে-

ই অংশে এবং তার ঠিক বিপরীত অংশে জোয়ার ও ভাঁটা হয়। সে কারণে প্রতিদিন পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানে দু'বার জোয়ার ও দু'বার ভাঁটা হয়।

সূর্যও জোয়ার ভাঁটা সৃষ্টি করে থাকে। অমাবশ্যায় চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর একদিকে ও একই লাইনে অবস্থান করে। সূর্যের আকর্ষণ চন্দ্রের তুলনায় কম হলেও উভয়ের মিলিত আকর্ষণ খুব প্রবল হয়। এ মিলিত আকর্ষণের ফলে যে জোয়ার হয়, তাতে পানি খুব বেশী ফুলে ওঠে। এরূপ জোয়ারকে ভরা কটাল বা তেজ কটাল (Spring tides) বলে। যখন চাঁদ ও সূর্য ৯০° দূরত্বে অবস্থান করে তখন সর্বনিম্ন ভাঁটা হয়। এভাবে ভাঁটা হওয়াকে বলা হয় মরা কটাল (Neap tides)।

নদী বা সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটা আমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণ বয়ে আনে। যেমনঃ

১। জোয়ার ভাঁটার দরুন বড় বড় বাণিজ্যিক জাহাজ বন্দরে গমনাগমন করতে পারে অতি সহজে।

২। জোয়ার ভাঁটার দরুন নদীতে স্রোত সৃষ্টি হয়। এর ফলে নদীর আবর্জনা সমুদ্রে বয়ে নিয়ে যায় এবং পানি নির্মল থাকে।

৩। জোয়ার ভাঁটার দরুন নদীতে তলানি জমতে পারে না। আর নদীও ভরাট হয় না।

৪। জোয়ার ভাঁটায় নদীর পানি লবনাক্ত হয়। যার কারণে পানির ঘনত্ব বেড়ে যায় এবং পানি সহজে বরফে পরিণত হয় না।

সুতরাং চাঁদ ও সূর্যের প্রভাবে সংঘটিত জোয়ার ভাঁটা করুণাময় আল্লাহর অশেষ রহমতের বহিঃপ্রকাশ।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا أَيَّةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُم.ْ

"আমি রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শন করেছি। অতঃপর রাতের নিদর্শন নিষ্প্রভ করে দিয়েছি এবং দিনের নিদর্শনকে দেখার উপযোগী করেছি। যাতে তোমরা তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার।"

[সুরা বাণী ইসরাইল:১২]

তিনি আরও বলেছেনঃ

وَمِنْ ابْتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَر.ُ

"আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রাত ও দিন, চাঁদ ও সূর্য অন্তর্ভুক্ত।"

[সুরা হা - মীম:৩৭]

আল্লাহ আরও বলেছেনঃ

اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ تَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى وَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْأُيْتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُون.َ

"তিনি চাঁদ ও সূর্যকে তাঁর আইনের অধীনে নিয়োজিত করে রেখেছেন। যে সময়কালের জন্য এদের নিয়োগ করা হয়েছে সে সময় পর্যন্ত এরা তাদের গতিপথে চলমান থাকবে। আল্লাহ তাআলা সকল বিষয় পরিচালনা করেন এবং তাঁর বিধান সমূহের ব্যাখ্যা দেন বিস্তৃতভাবে।"

[সুরা রা'দ:২]

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

"তিনিই সে মহান স্রষ্টা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে উজ্জল আলোকময় আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরনকারী রূপে; অতঃপর নির্ধারিত করেছেন এর জন্য নির্ধারিত মনজিলসমূহ যাতে করে তোমরা গননা করতে পারো বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব।আল্লাহ যথার্থতা ব্যতিত সবকিছু এমনিতেই সৃষ্টি করেননি তিনি প্রকাশ করেন নিদর্শনসমূহ সে সমস্ত লোকের জন্য যাদের জ্ঞান আছে।"

[সুরা ইউনুস: ০৫]

মহা পরাক্রমশালী সেই স্রষ্টা যিনি নিখুঁতভাবে বিশ্ববাসীর কল্যাণে চাঁদ ও সূর্যকে যথাস্থানে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন।

আকাশের সংরক্ষক ভূমিকা

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ
"আমি আকাশকে করেছি সংরক্ষিত ছাদ।"
[সুরা আম্বিয়াঃ ৩২]

এই আয়াত আকাশের এমন এক গঠনকে নির্দেশ করে, যা পৃথিবীকে রক্ষা করে বিভিন্ন ক্ষতিকর বাহ্যিক উপাদান থেকে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে, আকাশ বলতে সাধারণত বায়ুমণ্ডলকে বোঝায়, যা পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে। এই বায়ুমন্ডলের স্তরগুলো যেমন ওজোন স্তর, ট্রপোস্ফিয়ার, মেজোস্ফিয়ার ইত্যাদি আমাদের রক্ষা করে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি, উল্কা ও অন্যান্য ক্ষতিকর কণা থেকে।

প্রতিবছর লাখো ছোট উল্কাপিন্ড পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে কিন্তু বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে ঘর্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আবার ওজোন স্তর সূর্যের UV রশ্মি শোষণ করে যা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর।

এই সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আধুনিক যুগে স্পষ্ট হলেও কুরআনে তা বহু আগেই উল্লেখ আছে-যা আল্লাহর কুদরতের প্রমাণ এবং কুরআনের অলৌকিকতা প্রকাশ করে।

আকাশে কোনো ফাটল নেই

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন:

"আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।"

[সূরা আম্বিয়া: ৩২]
আল্লাহ আরও বলেছেনঃ

"তিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ স্তরে স্তরে। তুমি দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো ফাটল দেখতে পাবে না। পুনরায় দৃষ্টি ফেরাও, কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি?"
[সূরা আল-মুলক:৩]

আকাশে কোনো ফাটল, ছিদ্র বা বিশৃঙ্খলা নেই।এটি এমন এক সৃষ্টি যা পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও সুরক্ষিত। কুরআনে "আকাশ" (আরবি: السماء) শব্দটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়—মেঘ, বায়ুমণ্ডল, মহাকাশ, এমনকি বহুস্তরবিশিষ্ট মহাবিশ্ব বোঝাতে।

বিজ্ঞান অনুসারে, আমাদের বায়ুমণ্ডল (atmosphere) এবং মহাশূন্য (space) মিলিয়েই আধুনিক 'আকাশ' ধারণার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।বায়ুমণ্ডলীয় স্তরগুলো অত্যন্ত সুশৃঙ্খল।পৃথিবীর চারপাশে পাঁচটি প্রধান বায়ুমণ্ডলীয় স্তর রয়েছে (ট্রপোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ইত্যাদি)।প্রতিটি স্তর নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে, যেমন ওজন স্তর UV রশ্মি প্রতিহত করে।এ স্তরগুলোর মধ্যে কোনো ছিদ্র বা "ফাটল" নেই, যদিও দূষণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সম্ভব (যেমন: ওজোন হোল) — তবে তা প্রাকৃতিক কাঠামো নয়, বরং মানুষের কৃতকর্ম। মহাকাশের গঠনেও কোনো "ফাটল" নেই।মহাবিশ্বে গ্রহ, নক্ষত্র ও গ্যালাক্সিগুলো একটি নির্দিষ্ট গাণিতিক নিয়মে চলছে।হাবল টেলিস্কোপ বা জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ মহাকাশে কোনো অস্থিরতা বা "ফাটল" দেখতে পায়নি—বরং অগণিত গ্যালাক্সি এক অসাধারণ

সামঞ্জস্যে চলমান।আকাশে সমস্ত কিছু মহাকর্ষীয় টানে ভারসাম্য বজায় রেখে অবস্থান করছে—এটি একটি অলৌকিক এবং নিখুঁত কাঠামো।যদি কোনো "ফাটল" থাকতো, তাহলে এই ভারসাম্য ভেঙে মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যেত।

কুরআন বলছে, আকাশে কোনো ত্রুটি নেই, এটি দৃষ্টিনন্দন ও সুসংগঠিত সৃষ্টি।বিজ্ঞানও সেটাই বলছে,মহাবিশ্ব ও বায়ুমণ্ডল একটি সুনির্বাচিত নিয়মে চলে, কোথাও কোনো ফাটল বা বিশৃঙ্খলা নেই।সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানও কুরআনের সত্যতা প্রমাণ করে।

কুরআনের আয়াত মানুষকে আকাশের দিকে তাকিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে আহ্বান করে।যা গবেষণাভিত্তিক বিজ্ঞানকেও উৎসাহিত করে। বিজ্ঞান যতই এগোচ্ছে, কুরআনের ভাষ্যের সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

লোহার সৃষ্টি পৃথিবীর বাইরে

মানবসভ্যাতার এক অবিচ্ছেদ্য উপাদান হচ্ছে লোহা। কিন্তু লোহার উৎপত্তি এই পৃথিবীতে তো নয়-ই এমনকি আমাদের সৌরজগতের কোথাও লোহার সৃষ্টি হয়নি। বরং লোহার সৃষ্টি হয়েছে আমাদের সৌরজগতেরও বাইরে। বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে লোহার উৎপতি জানা গেছে। তবে পবিত্র কুরআনে লোহার উৎপত্তি বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

" আমি আরো নাযিল করেছি লোহা, তাতে রয়েছে প্রচন্ড শক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যান।''

[সুরা হাদীদ: ২৫]

লোহা সম্পর্কে যে সুরার আয়াত নাযিল হয়েছে সে সুরার নাম-হাদীদ। যার অর্থই হলো লোহা। লোহা এসেছে আমাদের সৌরজগতের বাইরে থেকে। কারণ আমাদের সৌরজগতের সমস্ত শক্তি মিলেও লোহার একটি অনু গঠন করতেও সক্ষম নয়।লোহা গঠনের জন্য একটি নির্দিষ্ট কঠিন তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা পৃথিবীর তো নেই বরং সূর্যেরও নেই। লোহা উৎপাদনের জন্য ১৫-২০ কোটি ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন। লোহার সৃষ্টি হয় নক্ষত্রদের কেন্দ্রেই। তবে এসব নক্ষত্রকে সূর্য থেকে ৮-১৫ গুন বড় হতে হবে । সূর্য থেকে আকারে ৮-১৫ গুন বড় নক্ষত্রদের মৃত্যুর মাধ্যমে লোহার সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিগব্যাং মহাবিস্ফোরনের সাড়ে তিনশো কোটি বছর পর তৎকালীন গ্যালাক্সীদের সংগঠন ক্লাস্টারদের মধ্যে ভয়ানক সংঘর্ষ হয় এবং সেসব ক্লাস্টারে স্থিত হাজার হাজার গ্যালাক্সিদের মধ্যেকার পারস্পরিক সংঘর্ষে গ্যালাক্সিমূহে স্থিত বিলিয়ন বিলিয়ন নক্ষত্রসমূহের ভয়াবহ সংঘর্ষ ও বিস্ফোরণ ঘটে। আর নক্ষত্রদের এই সংঘর্ষের ফলে নক্ষত্রদের কেন্দ্র হতে হিলিয়ামের চেয়ে ভারি মৌলকনাগুলো মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। যার মধ্যে লোহার পরমাণু ছিল অন্যতম। সেই সময় ক্লাস্টার গ্যালাক্সির সংঘর্ষের ফলে যে পরিমাণ লোহা মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে তার পরিমাণ ছিল আনুমানিক ৫০ বিলিয়ন বা ৫ হাজার কোটি সূর্যের ভরের সমপরিমাণ। এরপর

লোহার পরমাণুগুলো একে অন্যের সাথে জড়ো হয়ে তৈরি হতে থাকে বড় বড় লৌহ খন্ড যা পরবর্তিকালে গ্যালাক্সিদের মধ্যে ঘুরতে থাকে। আর সময়ের পরিক্রমায় লৌহগ্রহে পরিণত হয়। আবার এই লৌহ গ্রহগুলো নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং ভেঙে গিয়ে বিভিন্ন প্রকার উল্কাতে পরিনত হয়। যার মধ্যে বেশিরভাগ অংশই লোহা এবং নিকেল।পরবর্তীতে এই লোহা এবং নিকেল পৃথিবীর কেন্দ্র গঠন করে এবং আরও কিছু লোহা ও নিকেল ম্যাগমার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। যা কিনা পৃথিবীর প্রধান জালিকা শক্তি। পৃথিবী সৃষ্টির প্রায় ২০০ মিলিয়ন বছর পর পৃথিবীতে সৃষ্ট অগভীর সমুদ্রের পানিতে এসব মৌলিক কনিকা দ্রবীভূত হয়। এখন থেকে প্রায় সাড়ে তিন বিলিয়ন বছর আগে জন্ম নেয়া পৃথিবীর প্রথম প্রাণ এককোষী সায়ানো ব্যাকটেরিয়া সমুদ্রের তলদেশের লোহা এবং নিকেল মিশ্রিত পানিকেই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতো এবং বর্জ্য হিসেবে অক্সিজেন উৎপাদন করতো। এসব সায়ানো ব্যাকটেরিয়া নিজেদের দেহে লোহা ও অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তৈরি করে আয়োনাক্সাইড যা সমুদ্রের তলদেশে জমা হতে থাকে। আর এই স্পনীভূত শীলাসমূহ খনি থেকে উত্তোলনের মাধ্যমে আমরা লোহার চাহিদা পূরণ করে চলেছি প্রতিনিয়ত। আর এটাই হলো ৫০ বিলিয়ন বছর পূর্ব থেকে এখন পর্যন্ত লোহার দীর্ঘ পথযাত্রা।সুতরাং এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে লোহার উৎপতি পৃথিবীতে নয়। বরং লোহাকে মহাবিশ্ব থেকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। সুরা হাদীদের ২৫ নং আয়াতের মধ্যে সুমহান আল্লাহ বলেছেন "আমি নামিল করেছি লোহা"। আয়াতে উল্লিখিত "আনযালা" শব্দটি দ্বারা নাযিল হওয়া বোঝায়। যার মানে হলো অবতীর্ণ হওয়া, বাইরে থেকে আসা, আসমান থেকে অলৌকিকভাবে উপস্থিত হওয়া । সর্বোপরি বাইরে থেকে প্রেরিত হওয়ার অপর অর্থই হলো নাযিল হওয়া। এতে সুসম্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় পৃথিবী কিংবা আমাদের সৌরজগতের কোথাও লোহার উৎপত্তি হয়নি বরং আল্লাহ আসমান থেকে লোহাকে নাযিল করেছেন যা এতোক্ষনের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত।

বজ্রঝলক- বজ্রধ্বনি- বজ্রপাত

বজ্রঝলক-বজ্রধ্বনি-বজ্রপাত সম্পর্কে কুরআন ও বিজ্ঞান উভয়ই একটি গভীর ও চমৎকার দৃষ্টিভঙ্গি দেয়।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ
"তিনিই তোমাদেরকে বিজলির ঝলক দেখান ভয়ের এবং আশার জন্য, এবং তিনি সৃষ্টি করেন ভারী মেঘ।বজ্রধ্বনি তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে, ফেরেশতাগণও করে তার ভয়ে। তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে আঘাত করেন। আর এরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, অথচ তিনি মহাশক্তিশালী।
[সূরা রা'দ: ১২ -১৩]
আলোচ্য আয়াতে বিজলির ঝলক,বজ্রধ্বনি ও বজ্রপাত তিনটি বিষয়বস্তুরই স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এই আয়াতগুলোতে বিদ্যুৎ চমকের সৃষ্টি, মানুষের ভীতি ও আশার অনুভূতি, এবং আল্লাহর কুদরত ও ফেরেশতাদের ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞান থেকে জানা যায়,বিদ্যুৎ চমক (Lightning) হলো প্রাকৃতিকভাবে আকাশে মেঘের মধ্যে বা মেঘ ও ভূমির মধ্যে চার্জের ভারসাম্যহীনতার ফলে সৃষ্ট এক বিশাল বৈদ্যুতিক নির্গমন।মেঘের মধ্যে ঘর্ষণের ফলে ইলেকট্রিক চার্জ তৈরি হয়—মেঘের এক অংশে ধনাত্মক ও অন্য অংশে ঋণাত্মক চার্জ জমে।যখন এই চার্জের পার্থক্য একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে, তখন একটি হঠাৎ বৈদ্যুতিক নির্গমন ঘটে—যাকে বলে বজ্রপাত বা lightning strike। এই নির্গমনের ফলে আমরা দেখি ঝলকে ওঠা আলো, যেটাকে বলে বিদ্যুৎ চমক বা lightning flash।পরে আসে বজ্রধ্বনি, কারণ শব্দের গতি আলোর চেয়ে ধীর।

কুরআন যেমন বলে বিজলির ঝলক দেখে মানুষ ভয় পায়, বিজ্ঞানও বলে বজ্রপাত এক বিশাল শক্তিশালী ঝলক, যা মানুষের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে।বিজ্ঞান ব্যাখ্যা দিলেও, কুরআনের ভাষ্য হলো—এই প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সৃষ্টির নিদর্শন।

ফেরেশতার কার্যকলাপ: কুরআনে ফেরেশতাদের বজ্রের সাথে সংশ্লিষ্টতা যেমন বলা হয়েছে, বিজ্ঞান তা পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা না করতে পারলেও প্রাকৃতিক শক্তির পেছনে অদৃশ্য পরিচালকের ধারণা দেয়।

বিদ্যুৎ চমক কুরআনের দৃষ্টিতে শুধু একটি প্রাকৃতিক ঘটনা নয়, বরং এটি মানুষের জন্য উপদেশ ও আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন। বিজ্ঞান এর পেছনের কার্যপ্রক্রিয়া ব্যাখ্যা দিলেও, কুরআন আমাদের তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

আবার অনেকসময় অনবরত বিদ্যুৎ চমকের ফলে শুধু আলো দেখা যায় কিন্তু কোনো বজ্রপাত হয়না।এই অবস্থাকে বলে "heat lightning" বা "silent lightning"।এর কিছু বিজ্ঞানসম্মত কারণ হচ্ছে ---

> দূরবর্তী বজ্রপাত:

অনেক সময় মেঘের গভীরে বা অনেক দূরে বজ্রপাত হয়, যেখানে আমরা শুধু তার আলো দেখতে পাই, কিন্তু শব্দ (বজ্র) শুনতে পাই না। কারণ—শব্দের গতি কম এবং তা দূরত্বে হারিয়ে যায়।

>আকাশে চার্জের খেলা:

মেঘের মধ্যে ঘর্ষণে বৈদ্যুতিক চার্জ জমে, কিন্তু তা মাটিতে আঘাত করে না। তখন চার্জ মেঘের মধ্যেই discharge হয়। এতে আলো সৃষ্টি হয়, কিন্তু বজ্র শব্দ হয় না।

>আলো বেশি দেখা যায়:

মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ discharge হলে আলো চারপাশে প্রতিফলিত হয়ে বহুবার চোখে পড়ে। তখন মনে হয় “অনবরত ঝলকানি”, অথচ বজ্রপাত নেই।

>আবহাওয়ার আর্দ্রতা ও চাপ:

কিছু কিছু পরিবেশগত কারণে (যেমন উচ্চ আর্দ্রতা, গরম বাতাস) শুধু আলো বেশি উৎপন্ন হয়, কিন্তু তা শব্দে রূপ নেয় না বা কম থাকে।

কুরআনের দৃষ্টিতে অনবরত আলো ও বিদ্যুৎ ঝলক সম্পর্কে বলা হয়েছে বজ্রপাত ও আলোর ঝলককে এক ধরনের আল্লাহর নিদর্শন বলা হয়েছে, যা মানুষকে ভয় ও আশা দুটোই শেখায়।

সুরা রা'দের ১২ নং আয়াত পর্যালোচনা করলে দেখতে পায়,এই আয়াতে বিদ্যুতের আলোকে সরাসরি দেখার বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে শব্দ বা বজ্রপাতের কথা নেই।

ইবনে কাসীর, কুরতুবি ও অন্যান্য তাফসিরকাররা বলেন: বিদ্যুৎ (البَرْق) একটি আলোর ঝলক, যা মানুষকে আল্লাহর শক্তির কথা স্মরণ করায়।মানুষ যখন শুধু আলো দেখে কিন্তু শব্দ বা আঘাত পায় না, তখন তা তাদের ভয়ের সাথে আশার ইঙ্গিত দেয়—আল্লাহ্ আঘাত করেননি, কিন্তু স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

বিজ্ঞান বলে: অনবরত আলো চোখে লাগার কারণ হলো মেঘের ভেতরের বা দূরবর্তী বিদ্যুৎ চমক, যাকে বলা হয় silent lightning বা heat lightning।
কুরআন বলে: এই আলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদর্শন, যা ভয় ও আশার প্রতীক — আমাদের মনে করিয়ে দেয় আল্লাহ সবকিছুর নিয়ন্ত্রক।

গাছপালা আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বহুবার বলেছেন যে, তাঁর সৃষ্টিজগৎ — আকাশ, জমিন, পশু-পাখি, এমনকি গাছপালা , সবকিছুই আল্লাহর তাসবিহ (পবিত্রতা ও মহিমা) ঘোষণা করে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেনঃ

“তুমি কি দেখো না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে — সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পর্বত, বৃক্ষ, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ আল্লাহর সামনে সেজদা করে?”
[সূরা হজ : ১৮]

মহান আল্লাহ আরও বলেছেনঃ

“তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে সাত আসমান ও পৃথিবী এবং যে কেউ এদের মধ্যে রয়েছে; এমন কিছুই নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না, কিন্তু এদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না।”
[সূরা ইসরা : ৪৪]

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, গাছসহ প্রতিটি সৃষ্টিই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে, যদিও তা মানুষের শ্রবণ ও বোধগম্যতার বাইরে।

যখন গাছ বা পাহাড়ও সিজদা করতে পারে, তখন গাছগাছালির তাসবিহ একটি অলৌকিক সত্য যা আল্লাহর কাছে প্রিয় ও অর্থবহ।

বিজ্ঞানের আলোকে গাছের জীবন ও "তাসবিহ":

গাছগাছালি জীবিত, নিজের মতো করে সাড়া দেয়। তারা আলো, পানি, ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড শোষণ করে। গবেষণায় প্রমাণিত, গাছের "communication system" আছে; তারা রাসায়নিক সংকেত দিয়ে আশেপাশের গাছকে সতর্ক করে। আধুনিক গবেষণায় (যেমন plant bioacoustics) দেখা গেছে, গাছ নিচু ফ্রিকোয়েন্সিতে শব্দ উৎপন্ন করে, যা মানুষের শ্রবণসীমার বাইরে। একে “ultrasonic emission” বলা হয় — বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, এটি পরিবেশের প্রতি সাড়া।

যদিও বিজ্ঞান "তাসবিহ" শব্দটি ব্যবহার করে না, কিন্তু গাছের জীবন্ত প্রতিক্রিয়া, স্পন্দন ও গাছ নিচু ফ্রিকোয়েন্সিতে শব্দ উৎপন্ন করে, যা মানুষের শ্রবণসীমার বাইরে এসব জৈব-প্রক্রিয়াগুলো আল্লাহর তাসবিহের নিঃশব্দ প্রকাশ বলে বোঝা যায়।মানুষ শুনতে না পেলেও তারা তাসবিহ পাঠ করে নিচু শব্দতরঙ্গ তৈরি করে (inaudible to human)।

গাছগাছালি শুধু পরিবেশের সৌন্দর্য নয়, বরং তারা জীবন্ত, চেতনাসম্পন্ন সৃষ্টি যারা নিজস্ব উপায়ে আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে। কুরআন ও বিজ্ঞান — উভয়েই এই সত্যকে সমর্থন করে, যদিও ভাষা ও ব্যাখ্যার ধরন আলাদা।

পানি চক্র

বার্নাড পালিসি (Bernard Palissy) হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে পানি চক্রের বর্তমান কালের ধারণা বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছিলেন সমুদ্র হতে পানি কিভাবে বাষ্পীভূত হয় এবং পরে শীতল হয়ে মেঘে পরিণত হয়। এই মেঘমালা দূরবর্তী স্থানে গমন করে উপরে উঠে পরে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টির আকারে পতিত হয়। এই পানি নদী - নালা, খাল - বিল, হ্রদ রূপে জমা হয় এবং প্রবাহিত হয়ে একটি নিরবচ্ছিন্ন চক্রে পুনরায় মহাসাগরে ফিরে আসে।

খৃস্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীতে মিলিটাসের থ্যালেস (Thales of Miletus) বিশ্বাস করতেন যে, সাগরের উপরিভাগে ছিটানো পানির সূক্ষ্ম পানি কণাগুলোকে বাতাস সংগ্রহ করে বয়ে নিয়ে যায় দূরবর্তী স্থানে বৃষ্টিরূপে ফেলার জন্য। আদিকালে মানুষ ভূগর্ভস্থ পানির উৎস সম্পর্কে জানত না। তারা মনে করত মহাসাগরের পানিকে বাতাস বিভিন্ন মহাদেশের অভ্যন্তরে প্রবলভাবে ঠেলে দেয়। তারা আরো বিশ্বাস করত যে, এ পানি ফিরে আসে কোন গোপন পথ দিয়ে, অথবা অতল গহ্বর দিয়ে। এই পথটি মহাসাগরের সাথে সংযুক্ত এবং প্লেটোর সময় হতে এটাকে টার্টারাস (Tartarus) বলা হত। এমনকি ১৮ শতাব্দীর বিখ্যাত চিন্তাবিদ ডেসকার্টেস (Descartes) এ অভিমতই পোষণ করতেন। ১৯ শতাব্দী পর্যন্ত এ্যারিস্টোটল এর (Aristotle's) তত্ত্ব বহুল প্রচলিত ছিলো। এই তত্ত্বানুযায়ী পাহাড়ের বিশাল বিশাল ঠাণ্ডা গুহায় পানি ঘনীভূত এবং ভূগর্ভে অনেক হ্রদ সৃষ্টি হয়। এই হ্রদগুলো ঝর্ণাগুলোকে পানি সরবরাহ করে। আজ আমরা জানতে পেরেছি যে, মাটির ফাটল দিয়ে বৃষ্টির পানি চুয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করার কারণে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

আল-কুরআনে পানি চক্রের বর্ণনা নিম্নের আয়াতগুলোতে পাওয়া যায়।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُه

"তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, তারপর তিনি তা প্রবেশ করান ধরনীর প্রসবণসমূহের মধ্যে এবং তা দ্বারা নানা বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন।"

[সুরা যুমার: ২১]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ আরও বলেছেন :

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذٰلِكَ لايَتِ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُون.

"আর তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন এবং তদ্বারা ভূমিকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন ঐসব লোকদের জন্য যারা বোধশক্তিসম্পন্ন।"

[সুরা রুম: ২৪]

আল্লাহ আরও বলেছেন,

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاسْكَنْهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَدِرُونَ

"আর আমি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করি পরিমাণ মতো অতঃপর আমি তা জমিনে মাটিতে সংরক্ষণ করি। আমি উহাকে অপসারিত করতেও সক্ষম (অতি সহজেই)।"

[সুরা মুমিনুন : ১৮]

আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে বিশ্বে কেউই পানি চক্রের এমন নির্ভুল বর্ণনা দিতে পারেনি।বর্তমানে অনেক গবেষণার পর বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পেরেছে।

পর্বত সৃষ্টির রহস্য

ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানে ভাঁজকরণ প্রতিভাসটি অধুনা আবিষ্কৃত সত্য। ভাঁজকরণ' প্রক্রিয়া পবর্তমালা বা শ্রেণী গঠনের জন্য দায়ী। ভূপৃষ্ঠের কঠিন আবরণটি (Lithosphere) যার উপরে আমরা বাস করি, সেটা একটি কঠিন খোসার মত, পক্ষান্তরে এর গভীর স্তরগুলো গরম এবং গ্যাসীয় ও তরল (fluid) এবং তাই এগুলো যে কোন রকম জীবের জীবন ধারণের জন্য অনুপযোগী। এটাও আমরা জানি যে, পর্বতের দৃঢ় ও সুস্থিত অবস্থা ভাঁজকরণ ঘটনার সাথে গভীরভাবে জড়িত। কারণ ভূপৃষ্ঠে যে ভাঁজগুলো ছিল, সেই ভাঁজগুলোই স্তরসমূহকে যোগান দিয়েছিল মজবুত ভিত্তি। আর এই স্তরসমূহ পর্বত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভূতত্ত্ববিদগণ আমাদেরকে বলেন যে, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় ৩৭৫০ মাইল বা ৬০৩৫ কিলোমিটার এবং পৃথিবীর উপরিভাগের কঠিন আবরণ যার উপর আমরা বাস করি এটা খুবই পাতলা এর পুরুত্ব ১ থেকে ৩০ মাইল এর মধ্যে। যেহেতু কঠিন আবরণটি পাতলা, তাই এর কম্পনের সম্ভাবনাটা বেশি। পবর্তগুলো পেরেক বা তাঁবুর কীলকের মত কাজ করে ও ভূপৃষ্ঠের এই কঠিন আবরণটিকে ধরে রাখে এবং তাকে দেয় সুস্থিতি। কুরআনে হুবহু এরূপ বর্ণনাই রয়েছে।

"আমি কি পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ বিছানাস্বরূপ এবং পবর্তসমূহকে কীলকস্বরূপ সৃষ্টি করিনি?"
[সুরা নাবা : ৬-৭]

'আওতাদ' শব্দটির অর্থ খুঁটি বা কীলক (ঐগুলোর মত যা ব্যবহার করা হয় তাঁবু খাটাতে) এগুলো হল ভূতাত্ত্বিক ভাঁজসমূহের (Geologecal folds) গভীর ভিত্তি।

'পৃথিবী' (Earth) নামক একটি বই বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বুনিয়াদি reference পাঠ্য পুস্তক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পুস্তিকাটির অন্যতম লেখক ছিলেন ড. ফ্রাঙ্কপ্রেস (Dr. Frank Press), যিনি ছিলেন ১২ বছর ধরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান একাডেমীর প্রেসিডেন্ট এবং ছিলেন আমেরিকার প্রাক্তন

প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার (Jimmy Carter) এর বিজ্ঞান উপদেষ্টা। এই পুস্তকে তিনি চিত্র ও উপমাসহকারে বর্ণনা করেছেন যে, পর্বত কীলকাকৃতির; পর্বত নিজেই পুরোটার একটি ক্ষুদ্র অংশ যার মূল মাটির গভীরে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত। ড. প্রেসের মতে পর্বতসমূহ ভূপৃষ্ঠের কঠিন আবরণটিকে স্থিতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর কম্পন রোধে পবর্তসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন,

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَبِهِمْ ص وَجَعَلْنَا فِيهَا فجاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُون.َ

আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বতমালা যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে এদিক ওদিক ঢলে না যায়।
[সুরা আম্বিয়া : ৩১]

তাই দেখা যায় পর্বতসমূহের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মহিমান্বিত কুরআনে যেসব বর্ণনা রয়েছে ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কারের সাথে পুরোপুরিই সামঞ্জস্যপূর্ণ।
ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ বহু শক্ত স্তর মজবুত প্লেট বা পাতে (Plates) বিভক্ত যেগুলোর পুরুত্ব হল প্রায় ১০০ কিলোমিটার। এই পাত বা প্লেটগুলো আংশিক গলিত অঞ্চলে ভাসমান অবস্থায় থাকে। এই আংশিক গলিত অঞ্চলকে এসথেনোস্ফিয়ার (Aesthenosphere) বলে।

পর্বত গড়া শুরু হয় পাত বা প্লেটগুলোর প্রান্তসীমায়। পৃথিবীর কঠিন আবরণ (ভূত্বক) ৫ কিলোমিটার মোটা বা পুরু মহাসাগরের নিচে, প্রায় ৩৫ কিলোমিটার মোটা সমতল মহাদেশীয় পৃষ্ঠাদেশগুলোর নিচে এবং প্রায় ৮০ কিলোমিটার মোটা বিশাল পর্বতমালার নিচে। এগুলো হল মজবুত ভিত্তি যার উপর পর্বতগুলো দাঁড়িয়ে আছে। কুরআনও পর্বতসমূহের শক্ত ভিত্তি সম্পর্কে বলে,

وَالْجِبَالَ أَرْسَهَا.

"আর তিনি পর্বতগুলোকে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন।"
[সুরা নাযিয়াত:৩২]

অনুরূপ বক্তব্য কুরআনের ১৬: ১৫, ৩১: ১০ ও ৮৮: ১৯ স্থানে উল্লেখ আছে।

প্রবহমান দুই নদী

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَنِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِينِ

"তিনি দুটি সমুদ্রকে বহমান করেছেন, যারা একে অপরের সাথে মিলিত হয়। কিন্তু উহাদের মধ্যে রয়েছে এক পর্দা বা অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করতে পারে না।"
[সুরা আর - রহমান : ১৯-২০]
আরবী শব্দ 'বারজাখ' এর অর্থ হল অন্তরাল, পর্দা, আড়াল বা প্রাচীর। কিন্তু অন্তরাল, পর্দা বা প্রাচীর বলতে আমরা সাধারণত: যা বুঝে থাকি সেরূপ এটা কোন স্বাভাবিক বাহ্য পর্দা বা প্রাচীর বা অন্তরাল নয়।আরবী শব্দ 'মারাজা'-এর আক্ষরিক অর্থ হল তারা উভয়ে মিলিত হয় এবং একে অপরের সাথে মিশে যায়।
কুরআনের প্রাচীন ভাষ্যকারগণ দু'টি সমুদ্রের পানির জন্য দু'টি বিপরীতমুখী অর্থ অর্থাৎ দু'টির পানির ধারা পরস্পর মিলিত হয় এবং মিশে যায় অথচ একই সময়ে তাদের উভয়ের মাঝে রয়েছে অন্তরাল বা পর্দা-এর ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম হন না। আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে, যেসব স্থানে দু'টি ভিন্ন সাগর এসে মিলিত হয় তথায় উভয়ের মধ্যে থাকে পর্দা বা অন্তরাল। এই পর্দাটি দু'টি সাগরকে এমনভাবে পৃথক করে দেয় যে, যাতে করে প্রতিটি সাগর তার নিজস্ব তাপমাত্রা, লবনাক্ততা এবং ঘনত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে। সাগরবিদ্যার বিশারদগণ বর্তমানে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে উত্তম অবস্থানে রয়েছেন। দু'টি সাগরের মধ্যে রয়েছে ঢালু অদৃশ্য পানির পর্দা যার মধ্যদিয়ে পানি এক সাগর হতে অন্য সাগরে যায়।কিন্তু যখন এক সাগরের পানি অন্য সাগরে প্রবেশ করে তখন তার নিজস্ব পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য হারায় এবং অন্য পানির সাথে মিশে সমসত্ব দ্রবণে পরিণত হয়।এভাবে এই পর্দা বা অন্তরালটি দু'টি পানির জন্য একটি 'পরিবর্তনমূলক সমপ্রকৃতিকরণ' অঞ্চল হিসেবে কাজ করে।

এই বৈজ্ঞানিক ঘটনা যা কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে ড. উইলিয়াম হে (Dr. Willium Hay) যিনি একজন বহুল পরিচিত সমুদ্র বিজ্ঞানী এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিষয়ক বিজ্ঞানের অধ্যাপক, তিনি কুরআনে উল্লেখিত এই বৈজ্ঞানিক ঘটনাগুলোকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এরূপ ঘটনা উল্লেখ রয়েছে কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াতে-

وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا.

"এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন বহমান দু'টি সাগরের মধ্যে অন্তরায় বা পর্দা।"
[সুরা আন - নামল :৬১]

এই ঘটনা (অন্তরাল বা পর্দা সৃষ্টির ঘটনা) বহু স্থানেই ঘটে। ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মিলন স্থলে জিব্রাল্টার প্রণালীতে বিরাজমান বিভাজকসহ অনেক পর্দা বা অন্তরায় বহু স্থানেই দেখা যায়। একটি সাদা অন্তরাল বা পর্দা পরিষ্কারভাবে দেখা যায় Cape Point এ, Cape Peninsula তে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় যেখানে আটলান্টিক মহাসাগর ভারত মহাসাগরের সাথে মিলিত হয়েছে।

কিন্তু যখন কুরআন সুপেয় পানি ও লবণাক্ত পানির মধ্যে অন্তরাল/বিভাজক সম্পর্কে বলে তখন এই অন্তরালসহ 'একটি নিবৃত্তিকরণ পর্দা বা দুর্ভেদ্য অন্তরালের' উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে।
আল্লাহ বলেন:

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهُذَا مِلْحٌ أَجَاجٍ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا.

"তিনিই দুই সাগরকে সমান্তরালে প্রবাহিত করেন। এর একটি সুপেয়, মিষ্টি অপরটি লবনাক্ত, খর এবং উভয়ের মধ্যে তিনি রেখেছেন একটি পর্দা, দুর্ভেদ্য অন্তরাল যা এ দুটোকে মিশে যেতে দেয় না।"
[সুরা আল - ফুরকান : ৫৩]

আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, মোহনাসমূহে যেখানে সুপেয়, (মিষ্টি) পানি এবং লবনাক্ত (খর) পানি মিলিত হয়, এখানকার অবস্থাটা, দু'টি লবনাক্ত পানির সাগর যেখানে মিলিত হয়, সেখানকার অবস্থা হতে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। মোহনাসমূহে যা মিঠা বা সুপেয় পানিকে লবনাক্ত পানি হতে পৃথক করে সেটা আবিষ্কৃত হয়েছে। সেটা হল Pycnocline zone বা অঞ্চল যার চিহ্নিত ঘনত্ব ধারাবাহিকতাহীনভাবে দু'টি স্তরকে' পৃথক করে থাকে। এই পর্দা বা অন্তরালটির (বিভাজন অঞ্চলের) রয়েছে এমন লবনাক্ততা যা সুপেয় পানি ও লবনাক্ত পানি' এই উভয় প্রকার পানির লবনাক্ততা হতে আলাদা।

নীল-নদ প্রবাহিত হয়ে ভূমধ্যসাগরের যেখানে পড়েছে মিশরের সেই স্থানসহ অন্যান্য অনেক স্থানে এই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে থাকে।

সাগরের গভীরে অন্ধকার

সামুদ্রিক ভূতত্ত্ববিদ্যায় বিশ্ব বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ ও জেদ্দার বাদশাহ আবদুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দুর্গারাওকে কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতের উপর তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হয়-

أَوْ كَظُلُمت فِي بَحْرٍ تُجي يَغْشَهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سحاب ظلمت بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرْهَا. وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُّوْرٍ.

"অথবা (অবিশ্বাসীদের অবস্থা) এর উপমা এমন, যেমন এক বিশাল গভীর সমুদ্রের তলের অন্ধকার, উপরে একটি তরঙ্গ ছেয়ে আছে তার উপর আরও একটি তরঙ্গ এবং এর উপরে ঘনকালো মেঘমালা। অন্ধকারের উপর অন্ধকার ছেয়ে আছে। এমনকি কেউ যদি তার হাত বের করে তবে সে তা আদৌ দেখতে পাবে না। আল্লাহ যাকে আলো দেন না তার জন্য আর কোন আলো নেই।"
[সুরা আন - নুর : ৪০]

অধ্যাপক দুর্গারাও বলেন যে, বিজ্ঞানীগণ কেবলমাত্র বর্তমানে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মহাসাগরের গভীরে যে অন্ধকার বিরাজ করছে এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। কোনরূপ সাহায্য ছাড়া মানুষ পানির নিচে ২০ হতে ৩০ মিটার অধিক গভীরে ডুব দিতে সক্ষম নয় এবং মহাসাগরীয় অঞ্চলের ২০০ মিটার অধিক গভীরে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। কুরআনের এই আয়াত সকল সাগরের কথা উল্লেখ করে না। কারণ প্রতিটি সাগর অন্ধকার স্তরে স্তরে পুঞ্জিভূত করে রাখে না। এ আয়াত বিশেষভাবে গভীর সাগর বা গভীর মহাসাগরের কথাই উল্লেখ করেছে। যেহেতু কুরআন বলে 'বিশাল গভীর মহাসাগরের মধ্যে অন্ধকার।' গভীর মহাসাগরে এই স্তরে স্তরে অন্ধকার সৃষ্টি ২টি কারণে হয়ে থাকে:

(১) আলোক রশ্মি ৭টি রং এর সমন্বয়ে গঠিত। এ সাতটি রং হল বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল (বেনীআসহকলা)। আলোক রশ্মি যখন পানিতে আপতিত হয় তখন প্রতিসরণ সংঘটিত হয়ে থাকে। পানির উপরিভাগের

১০ হতে ১৫ মিটার গভীরে পানি লাল রংকে শোষণ করে। তাই একজন ডুবরী ২৫ মিটার গভীরে যদি যান এবং আঘাতপ্রাপ্ত হন তাহলে তিনি তার রক্তের লাল রং দেখতে সক্ষম হবেন না। কারণ লাল রংটি এই গভীরতায় পৌছতে পারে না। অনুরূপভাবে কমলা রং ৩০ হতে ৫০ মিটার, হলুদ ৫০ হতে ১০০ মিটার, সবুজ ১০০ হতে ২০০ মিটার, নীল ২০০ মিটার ছাড়িয়ে এবং সর্বশেষ আসমানী ও বেগুনী ২০০ মিটারের অধিক গভীর পানিতে শোষিত হয়। এক স্তরের পর অন্য স্তরে ক্রমাগতভাবে রংসমূহের অন্তর্ধান মহাসাগরে ক্রমবর্ধমান হারে অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে থাকে- অর্থাৎ আলোর স্তরে স্তরে অন্ধকার সৃষ্টি হতে থাকে। ১০০০ মিটার গভীর নীচে পরিপূর্ণ অন্ধকার বিরাজ করে।'

(২) সূর্যের রশ্মি মেঘমালার দ্বারা শোষিত হয় যাতে আলোক রশ্মিগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে মেঘমালার নীচে সৃষ্টি হয় এক অন্ধকার স্তর। এটাই হল অন্ধকারের প্রথম স্তর। আবার যখন আলোক রশ্মিসমূহ মহাসাগরের পৃষ্ঠদেশে পৌঁছায় তখন এগুলো ঢেউ এর উপরিতল কর্তৃক প্রতিফলিত হয়, ফলে ঢেউ এর উপরিতল দীপ্তিময় চক চকে হয়ে উঠে। সুতরাং তরঙ্গগুলোই আলোককে প্রতিফলিত করে এবং অন্ধকার সৃষ্টি করে। অপ্রতিফলিত রশ্মিগুলো পানি ভেদ করে সমুদ্রের গভীরে পৌছায়। সুতরাং মহাসাগর দু'টি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি তার পৃষ্ঠদেশ বা উপরিভাগ যা আলো ও তাপ দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। অন্যটি গভীর অঞ্চল যা চিহ্নিত করা যায় অন্ধকার দ্বারা। পৃষ্ঠদেশ বা উপরিভাগ আবার মহাসাগরের গভীর অঞ্চল হতে পৃথক হয়েছে তরঙ্গমালার দ্বারা।

সাগর ও মহাসাগরের গভীর অঞ্চলের পানিকে ঢেকে রেখেছে অভ্যন্তরীণ তরঙ্গমালা। কারণ গভীর অংশের পানির ঘনত্ব তার উপরিভাগের পানির ঘনত্ব হতে অধিক।

অভ্যন্তরীণ তরঙ্গমালার নিম্ন হতেই অন্ধকার শুরু হয়। এমনকি মাছেরাও সাগর মহাসাগরের গভীর অঞ্চলে দেখতে পায় না। তাদের একমাত্র আলোর উৎস হল তাদের নিজেদের দেহের আলো।

আল-কুরআন এটা যথার্থভাবেই বর্ণনা করেছে-

"এক বিশাল গভীর সমুদ্রের মধ্যে অন্ধকার, উপরে একটি তরঙ্গ ছেয়ে আছে তার উপর আরও একটি তরঙ্গ।"

অন্যকথায়, এই তরঙ্গমালার উপরে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার তরঙ্গ অর্থাৎ ঐ তরঙ্গগুলো যা দেখা যায় মহাসাগরের পৃষ্ঠদেশে বা উপরিভাগে। কুরআনের আয়াতটি আরও বলে: শীর্ষদেশে রয়েছে ঘন কালো মেঘমালা, একের উপর এক গভীর অন্ধকার। যেমন বর্ণনা করা হয়েছে- এই মেঘমালা একটার উপর আর একটা আড়াল বা পর্দা হিসেবে রয়েছে এবং বিভিন্ন স্তরে আলোর রং শোষণ করে অতিরিক্ত অন্ধকার সৃষ্টি করে।

অধ্যাপক দুর্গারাও তার বক্তব্যের পরিসমাপ্তি টানেন এ কথা বলে: ১৪০০ বছর পূর্বে একজন স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে এসব বিস্ময়কর ঘটনাসমূহের এরূপ সুবিস্তারিত বর্ণনা দেয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। সুতরাং এ সকল তথ্য অবশ্যই কোন অতিপ্রাকৃতিক উৎস হতেই এসেছে।

সুতরাং মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী মুহম্মদ (সাঃ) এর উপর কুরআন নাযিলের মাধ্যমে এই অলৌকিক জ্ঞান দান করেছিলেন।

পৃথিবীর জীবনের সাথে মশার তুলনা

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মশা অথবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে লজ্জাবোধ করেন না। সুতরাং যারা ইমান এনেছে তারা তো বিশ্বাস করবে যে, এ উপমা তাদের রবের পক্ষ হতে খুবই স্থানোপযোগী হয়েছে, আর যারা কাফির সর্বাবস্থায় তারা এটাই বলবে যে, এসব নগন্য বস্তুর উপমা দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্যই বা কি? তিনি এর দ্বারা অনেককে বিপথগামী করে থাকেন এবং এর দ্বারা অনেককে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, আর এর দ্বারা তিনি শুধু ফাসিকদেরকেই বিপথগামী করে থাকেন।"

[সুরা বাকারা: ২৬]

রাবী ইবন আনাস (রহঃ) বলেন যে, এটা একটা মযবুত দৃষ্টান্ত যা দুনিয়ার দৃষ্টান্তরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষনায় পাওয়া গেছে, মশা ক্ষুধার্ত থাকা পর্যন্ত জীবিত থাকে এবং মোটা তাজা হলেই মারা যায়। ঠিক তেমনি দুনিয়াবাসী যখন আল্লাহকে ভুলে গিয়ে ইহলৌকিক সুখ-সম্ভোগ প্রাণভরে ভোগ করে, তখনই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পাকড়াও করেন। আদ জাতি, সামুদ জাতি, আয়কাবাসী, লূত সম্প্রদায়, ফেরাউনের দলবল এদের সকলকেই আল্লাহ এ নিয়মেই পাকড়াও করেছিলেন। মশার যাপিত জীবনের সাথে

তাদের সম্পূর্ণ মিল খুজে পাওয়া যায়। মশা যখন খেয়ে মোটা তাজা হয় ঠিক তখনই মারা যায়। ঠিক তেমনিভাবে উপরোল্লিখিত জাতিগুলো যখন আল্লাহকে ভুলে দুনিয়া নিয়ে মেতে উঠেছিল, সুখ-সম্ভোগ ভোগ, আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছিল ঠিক তখনই মহান রব্বুল আলামিন সেসব জাতিকে সমূলে ধ্বংস করেছিলেন।

সুতরাং কুরআনে এই আয়াত নাযিল করে আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করেছেন। যাতে আমরা পূর্বের সেসব অবাধ্য জাতির মতো না হই।১৪০০ বছর আগে নাযিল হওয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা মশার ব্যাপারে যে বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়েছেন তা বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার করেছে।

মৌমাছির জীবন যাপন পদ্ধতি

পবিত্র কুরআ্যানে আল্লাহ বলেন:

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِى مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. ثُمَّ كُلِى مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ
رَبِّكَ ذللاً

"তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে মৌচাক বানানোর কৌশল শিখিয়ে মৌমাছিকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, মৌচাক বানাও পাহাড়ে, গাছে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে। তারপর আহরণ কর সব রকম ফুলের রস এবং তোমার প্রতিপালকের প্রশস্ত সহজ পথ দক্ষতার সাথে বের করে ফেল।”

[সুরা নাহল: ৬৮-৬৯]

ভন ফ্রিসচ (Von-Frisch) ১৯৭৩ সালে মৌমাছিদের আচরণ ও বার্তা বিনিময় ও যোগাযোগ বিষয়ে গবেষণা কর্মের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। একটি মৌমাছি নূতন কোন বাগান বা ফুলের সন্ধান পেলে চাকে ফিরে এসে সে তার সঙ্গীদের তথায় পৌছানোর সঠিক দিক ও মানচিত্র মৌমাছি নৃত্য (Bee dance) নামে পরিচিত পদ্ধতির মাধ্যমে বলে দেয়। মৌমাছিদের এই গতিবিধির উদ্দেশ্য হল শ্রমিক মৌমাছিদের মধ্যে বার্তা প্রেরণ। মৌমাছিদের এই গতিবিধির অর্থ ও উদ্দেশ্য আলোকচিত্র ও অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। আল-কুরআন উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখ করেছে কিভাবে একটি মৌমাছি দক্ষতার সাথে তার প্রভুর প্রশস্ত পথ বের করে ফেলে।

শ্রমিক মৌমাছি বা সৈনিক মৌমাছি হল স্ত্রী মৌমাছি। সূরা আন নাহল সূরা নং ১৬ আয়াত নং ৬৮-৬৯ তে মৌমাছির জন্য স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে 'ফাসলুকি' এবং 'কুলি'। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যেসব মৌমাছি মৌচাক ছেড়ে খাদ্য সংগ্রহে বের হয় তারা স্ত্রী মৌমাছি। অন্য কথায় বলা যায় শ্রমিক মৌমাছি বা সৈনিক মৌমাছি হল স্ত্রী মৌমাছি।

শেক্সপিয়ারের হেনরী দা ফোর্থ (Henry the Furth) নাটকের কিছু সংলাপে মৌমাছি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৌমাছিরা সৈনিক,তাদের আছে একজন রাজা। শেক্সপিয়ারের (Shakespeare) সময়কালে লোকেরা মনে করত শ্রমিক মৌমাছিরা হল পুরুষ জাতীয় মৌমাছি। তারা গৃহে ফিরে রাজা মৌমাছির নিকট জবাবদিহিতার সম্মুখীন হয়। আসলে এটা মোটেই সত্য নয়। বরং শ্রমিক মৌমাছিরা হল স্ত্রী মৌমাছি। তারা কাজের প্রতিবেদন পেশ করে রাজার নিকট নয় বরং তাদের রাণীর নিকট। এ সত্যটি আবিষ্কার করতে আধুনিক গবেষণা বিগত ৩০০ বছর পর্যন্ত সময় নিয়েছে।

পিপীলিকার জীবন যাপন পদ্ধতি

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنُ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُون.َ

"সুলায়মানের সামনে জিন, মানুষ ও পাখিদের বাহিনীকে সমবেত করা হল, উহাদেরকে বিন্যস্ত করা হল বিভিন্ন ব্যূহে। যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত এলাকায় পৌঁছাল, তখন একটি পিপীলিকা বলল হে পিপীলিকারা! তোমরা তোমাদের গর্তে/ঘরে প্রবেশ কর যেন সুলায়মান এবং তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতেল পিষ্ট করে না ফেলে।"

[সুরা নামল : ১৭-১৮]

অতীতে সম্ভবত: কিছু ব্যক্তি রূপকথার ও গল্পের বই মনে করে উপহাস করে থাকতে পারে কুরআনকে যাতে উল্লেখ আছে পিপীলিকাদের পারস্পরিক কথাবার্তা বলার এবং উন্নত সূক্ষ্ম পন্থায় বার্তা বিনিময়ের বিষয়। সাম্প্রতিক সময়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পিপীলিকাদের জীবন ধারার এমন সব সঠিক তথ্য প্রদর্শন করেছে যা পূর্ববর্তীরা মোটেই জানতো না। গবেষণায় দেখা গেছে মানুষের জীবন ধারার সাথে যে সকল প্রাণী বা কীট পতঙ্গের জীবন ধারার ঘনিষ্ঠতম সাদৃশ্য রয়েছে সেটা হল পিপীলিকার জীবন ধারা। পিপীলিকা সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত গবেষণালব্ধ ফলাফল হতে এটা সহজেই প্রতীয়মান হয়-

১. মানুষের ন্যায় পিপীলিকা একইভাবে মরদেহ কবরস্থ করে।

২. পিপীলিকাদের রয়েছে শ্রম বিভাজনের পরিশীলিত উন্নত পদ্ধতি, তাই তাদের পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক, শ্রমিক প্রধান, শ্রমিক ইত্যাদি আছে।

৩. মাঝে মধ্যে খোশ গল্প করার জন্য তারা নিজেরা এক সঙ্গে মিলিত হয়।

৪. নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য তাদের রয়েছে উন্নত যোগাযোগ পদ্ধতি।

৫. তারা নিয়মিত বাজার বসায় দ্রব্যাদি বিনিময়ের জন্য।

৬. শীতকালে দীর্ঘসময়ের জন্য তারা খাদ্যশস্য জমা করে রাখে এবং যদি শস্য কণার অঙ্কুরিত হওয়া শুরু হয় তারা তখন শেকড়গুলো কেটে দেয় মনে হয় তারা যেন এটা বুঝে যে, অঙ্কুর বৃদ্ধির জন্য রেখে দিলে এটা পচে নষ্ট হয়ে যাবে।
জমাকৃত খাদ্যশস্য বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেলে তারা সেগুলো রোদে শুকানোর জন্য বের করে আনে, শুকিয়ে গেলে আবার তারা সেগুলো ভিতরে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যেন তারা এটা জানে যে, আর্দ্রতা অঙ্কুর গজানোর কারণ এবং এর ফলে শস্যের পচন হতে পারে।
কুরআন - এটা সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই।পিপীলিকার এই জীবন যাপন পদ্ধতি বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত। সম্প্রতি এক গবেষণায় এটা নিশ্চিত হয়েছে।

মাকড়সার ঘর সবচেয়ে দুর্বল

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন:

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون.َ

"যারা আল্লাহকে ছেড়ে অপর কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাদের উপমা মাকড়সার মত, যে নিজের জন্য একটি ঘর বানায়। নিশ্চয়ই সব ঘরের চেয়ে মাকড়সার ঘরই অধিক দুর্বল যদি তারা জানতো।"

[সুরা আনকাবুত: ৪১]

কুরআন হালকা-পাতলা, সূক্ষ্ম, দুর্বল-ক্ষণভঙ্গুর হিসেবে মাকড়সার জালের বাহ্যিক বর্ণনা দেয়া ছাড়াও কুরআন মাকড়সার ঘরে আত্মীয়তার অসারতার উপরেও জোর দিয়েছে। মাকড়সা স্বামী-স্ত্রী, সন্তানদের মধ্যে মারাত্মক রকমের শত্রুতা দেখা যায়। স্ত্রী মাকড়সা প্রায়শই মিলনের পর পুরুষ মাকড়সাকে খেয়ে ফেলে। ছানারাও মাকে মেরে ফেলার মতো আচরণ করে।

কুরআনের উপমা নিছক বাহ্যিক কাঠামো নিয়ে নয়, বরং এর মধ্যে গভীর দার্শনিক ও বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। আল্লাহ ছাড়া যেকোনো ভরসা মূলত আত্মঘাতী ও অস্থায়ী, যেমনটা মাকড়সার ঘর — বাহ্যিকভাবে জটিল, কিন্তু ভিতরে থেকে ভঙ্গুর।

এই নীতিগর্ভ রূপক দৃষ্টান্তটি ঐসব লোকদের এরূপ সম্পর্কের দুর্বলতার দিকটি উল্লেখ করে, যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এ জগতে ও পরজগতে নিজেদের জন্য অন্যদের নিকট নিরাপত্তা অনুসন্ধান করে থাকে।

আঙুর - খেজুর - মধুর উপকারিতা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

"তোমরা খেজুর ও আঙ্গুর হতে পানীয় এবং উত্তম রিযিক তৈরি করো।"

[সূরা নাহল : ৬৭]

তিনি আরও বলেন,

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاس

"উহার (মৌমাছির) উদর হতে বের হয় নানা বর্ণের পানীয় যার মধ্যে রয়েছে মানুষের জন্য আরোগ্য।"

[সুরা নাহল : ৬৯]

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত — খেজুর ও আঙ্গুরে রয়েছে শক্তি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। মধুতে জীবাণুনাশক ও হেলিং বৈশিষ্ট্য রয়েছে।ক্ষত স্থানে মধু ব্যবহার করলে মধু ক্ষতটিতে আর্দ্রতা ধরে রাখে এবং কম ক্ষতচিহ্নযুক্ত চামড়া থেকে যায়।কারন মধুর ঘনত্বের কারনে ছত্রাক বা জীবানু জন্মাতে পারেনা।অর্থাৎ মধু জীবানুনাশক পদার্থ ।মধুতে আরও রয়েছে ফ্রুকটোজ এবং ভিটামিন "কে" । কুরআনে এসব জ্ঞান নাযিল হওয়ার বহুদিন পরে বিজ্ঞান এসব উপাদানের উপকারিতা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। আর বিজ্ঞানীদের এই আবিষ্কার কুরআনের সত্যতা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করে।

মধু ও তার উৎস

মৌমাছি নানা প্রকার ফুল ও ফল হতে রস আহরণ করে এবং এগুলো দিয়ে দেহের অভ্যন্তরে আত্তিকরণে মধু তৈরী করে। এরপর এই মধু চাকের মোম কোষে জমা করে রাখে। মাত্র দুই শতাব্দী পূর্বে মানুষ এ তথ্য জানতে পেরেছে যে, মৌমাছির পেট হতেই মধু পাওয়া যায়। অথচ ১৪০০ বছর পূর্বে কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে এ প্রকৃত ঘটনাটি উল্লেখ করেছে।

পবিত্র কুরআনের মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ.

"উহার (মৌমাছির) উদর হতে বের হয় নানা বর্ণের পানীয় যার মধ্যে রয়েছে মানুষের জন্য আরোগ্য।"

[সুরা নাহল : ৬৯]

মধু, তার উৎস সম্পর্কে কুরআনে ধারণকৃত এই জ্ঞান, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার বহু শতাব্দী পরে বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে।

উট আল্লাহর এক অপূর্ব নিদর্শন

পবিত্র কুরআনে মহান রাব্বুল আলামিন বলেছেনঃ
“তারা কি উটের দিকে তাকিয়ে দেখে না, কীভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?” [সূরা গাশিয়া :১৭]

এই আয়াতে আল্লাহ উটের দিকে লক্ষ্য করতে বলেছেন — অর্থাৎ, উটের গঠন, উপযোগিতা ও বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য আমাদের চিন্তার খোরাক হওয়া উচিত। এটি শুধু একটি প্রাণী নয়, বরং এটি আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন।

উট হলো মরুভূমির পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ও বিস্ময়কর প্রাণী। নিচে তার গঠনের দিক থেকে কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল দেওয়া হলো:

(ক) গঠন ও শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য:

>কুঁজ (হাম্প) চর্বি জমিয়ে রাখে, যা পানি ও শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে।

>দ্বি-স্তরীয় চোখের পাতা ও ঘন পাপড়ি ধুলাবালি ও ঝড় থেকে চোখকে রক্ষা করে।

>নাকের বিশেষ গঠন ধুলা ছেঁকে ফেলে, নাক দিয়ে পানি কম বের হয়।

>পা চওড়া ও প্যাডযুক্ত পা — বালির উপর হাঁটতে সুবিধা হয়।

> পানির সংরক্ষণ ক্ষমতা একবারে ৪০–৫০ লিটার ।

>পানি পান করে ১০ দিন পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে

>শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। শরীরের তাপমাত্রা ৩৪°C থেকে ৪১°C পর্যন্ত উঠানামা করে — ঘাম না ঝরিয়ে পানি বাঁচায়

(খ)ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য:

>গাড়ি, দুধ, মাংস, চামড়া ও পরিবহন — সবকিছুতে ব্যবহার উপযোগী।

>মরুভূমির জটিল পরিবেশে উট ছাড়া টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব।

অতএব,উট হলো এমন একটি প্রাণী, যার গঠন এবং জীবনধারা সরাসরি আল্লাহর নিপুণ সৃষ্টিশীলতার প্রমাণ।কুরআন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে — এই প্রাণীটিকে "দেখো", "ভাবো", এবং আল্লাহর মহত্ব বুঝো।

অন্যদিকে বিজ্ঞান বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে, কীভাবে এই প্রাণীটি চরম প্রতিকূল পরিবেশেও বেঁচে থাকে — যা এক চমকপ্রদ সৃষ্টি।

দুগ্ধ উৎপাদন প্রক্রিয়া

মুসলিম বিজ্ঞানী ইবনে নাফিস (Ibn Nafees) রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কীয় তথ্য বর্ণনা দেয়ার ৬০০ বৎসর পূর্বে এবং উইলিয়াম হার্ভে (Willium Herwey) এই রক্ত সঞ্চালনের জ্ঞান পশ্চিমা জগতে ছড়িয়ে দেয়ার ১০০০ বছর পূর্বে কুরআন অবতীর্ণ হয়। প্রায় ১৩০০ বছর পূর্বে এটা জানা ছিল যে, অন্ত্রে কি ঘটে এবং বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান শোষিত হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গের পুষ্টি সাধন করে। কুরআনের একটি আয়াত দুধের উপাদানগুলোর উৎসের বর্ণনা দিয়েছে যা উল্লেখিত অভিমতের সাথে সংগতিপূর্ণ।

উপরোক্ত ধারণা সম্পর্কে আল-কুরআনের আয়াত বুঝতে হলে এটা জানা প্রয়োজন যে, অন্ত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়, ফলে খাদ্যদ্রব্য বিশ্লেষিত হয়ে বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত হয়। এই উপাদানগুলো একটি জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী সরাসরি কখনও কখনও লিভারের পথ পরিক্রমায় রক্ত প্রবাহে মিশে। রক্ত ঐগুলো বহন করে নিয়ে যায় দেহের সকল অঙ্গপ্রতঙ্গে যাদের মধ্যে আছে দুগ্ধ উৎপাদনকারী গ্রন্থি।

সহজ কথায়, অন্ত্রে বিদ্যমান বস্তুসামগ্রীর মধ্যে বিশেষ বিশেষ উপাদান অন্ত্রপ্রাচীরের নালীতে প্রবেশ করে এবং এইসব উপাদানগুলো রক্তের দ্বারা বাহিত হয়ে বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গে পৌঁছায়।

যদি আমরা কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটির মর্মার্থ বুঝতে চাই তাহলে, উল্লেখিত ধারণাটির যথার্থ মূল্যায়ন করা যায়।

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ
فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য গবাদি পশুর মধ্যে শিক্ষা রয়েছে। আমি তাদের পেটের গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ যা তাদের জন্য তৃপ্তিদায়ক, যারা পান করে।"

[সুরা আন - নাহল : ৬৬]

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ আরও বলেন,

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُم فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُون.َ

"আর অবশ্যই তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, তোমাদেরকে পান করাই এদের উদরস্থিত বস্তু হতে একটি জিনিস (দুধ) এবং তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারিতা আর তোমরা তাদের কতককে খাও।"

[সুরা মুমিনুন : ২১]

১৪০০ বছর পূর্বে কুরআনে দুগ্ধ উৎপাদনের বর্ণনাটি বিস্ময়করভাবে হুবহু একই যা আধুনিক শরীরতত্ত্ববিদ্যা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে।

পানি হতেই সকল প্রানের অস্তিত্ব

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُون.َ

"অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (একক সৃষ্টি হিসেবে) ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল এরপর আমি তাকে পৃথক করে দিয়েছি এবং প্রতিটি জীবিত জিনিসকে পানি হতে সৃষ্টি করেছি তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?
[সুরা আম্বিয়া : ৩০]
কুরআনের নিম্নের আয়াতে পানি হতে মানুষ সৃষ্টির উল্লেখ রয়েছে:
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا.
"আর তিনিই পানি হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এ থেকে তার বংশগত ও অপরটি বৈবাহিক সম্পর্ক- এ দুটি আত্মীয়তার ধারা সৃষ্টি করেছেন। তোমার প্রতিপালক সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।"
[সুরা ফুরকান : ৫৪]

কেবলমাত্র বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার পরেই আমরা জানতে পেরেছি যে, জীব কোষের যে মৌলিক উপাদান, সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm) তা ৮০% পানি দিয়ে তৈরী। আধুনিক গবেষণা আরও প্রকাশ করেছে যে, অধিকাংশ জীবেই ৫০% হতে ৯০% পানি আছে এবং প্রতিটি জীবন্ত সত্তারই বেঁচে থাকার জন্য পানির প্রয়োজন।

সমস্ত জীবিত জিনিসই পানির দ্বারা গঠিত এ সত্যটি ১৪০০ বছর পূর্বে অনুমান করা কি কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব? অধিকন্তু মরুভূমিতে যেখানে সর্বদাই রয়েছে পানির অভাব, সেখানে এরূপ একটি অনুমানও কি কোন মানুষের পক্ষে কল্পনাসাধ্য হতে পারে?

কুরআনের নিম্নের আয়াতে পানি হতে প্রাণী সৃষ্টির উল্লেখ রয়েছে:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاء.

"আর আল্লাহ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি হতে।"

[সুরা আন - নুর : ৪৫]

মানবজাতিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَـٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْـًٔا مَّذْكُورًا
“মানুষের উপর কি এমন এক সময় অতিক্রান্ত হয়নি, যখন সে কোনো উল্লেখযোগ্য বস্তু ছিল না?”
[সূরা আল-ইনসান : ১]

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন তার একদম শুরুর অবস্থার কথা।
এখানে মূলত তিনটি বিষয় উঠে এসেছে:

ক. সময়ের বিস্তৃতি:
"দাহর" অর্থ হচ্ছে দীর্ঘ সময়, চিরকাল বা অসীম সময়। মানুষ যখন ছিল না, তখন সময় চলমান ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি সময়ের এক মহাজাগতিক ধারণা উপস্থাপন করে, যা কুরআনের গভীরতা তুলে ধরে।

খ. মানুষের অস্তিত্বহীনতা:
“সে কোনো উল্লেখযোগ্য বস্তুও ছিল না।”এই অংশে বলা হয়েছে, মানুষ ছিল না শুধু শারীরিকভাবে নয়, বরং এমন অবস্থায় ছিল যে তার নাম-নিশানা পর্যন্ত ছিল না। মানুষ ছিল অস্মরণীয় ও অচিহ্নিত।
গ. সৃষ্টির মহিমা:

পরবর্তী আয়াতে (৭৬:২) গিয়েই মহান আল্লাহ বলেছেন — "আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত শুক্রবিন্দু থেকে।এই ধারাবাহিকতায় বোঝা যায়, মানুষ এক অদৃশ্য অবস্থা থেকে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি।

বিজ্ঞান মতে, মানব দেহ শুরু হয় zygote (জাইগোট) নামক একক কোষ থেকে—যা স্ফুটিত হয় শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনে।এই কোষটি একসময় দেখা যায় না, জানা যায় না, এমনকি অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না।

বিজ্ঞান অনুযায়ী আধুনিক মানুষ (Homo sapiens) পৃথিবীতে এসেছে আনুমানিক ২-৩ লক্ষ বছর আগে, যেখানে পৃথিবীর বয়স ৪.৫ বিলিয়ন বছর।তাই এই বিপুল সময়ের তুলনায় মানুষের অস্তিত্ব খুব সাম্প্রতিক এবং এর আগের সময়ে সে ছিল "অস্তিত্বহীন"।

মানুষের জিনোম বিশ্লেষণেও দেখা যায়, তার গঠন এসেছে এক দীর্ঘ বিবর্তনের মাধ্যমে, যা প্রমাণ করে,মানুষ এক সময় প্রকৃতিগতভাবে অচেনা ছিল, এবং গঠন প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে "উল্লেখযোগ্য কিছু" হয়েছে।

সুরা আল ইনসানের এই আয়াত আমাদের শিখায়—অহংকার করার কিছু নেই, কারণ আমরা এক সময় কিছুই ছিলাম না। সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত, যিনি আমাদের অস্তিত্ব দিয়েছেন।

বিজ্ঞান আমাদের দেহের গঠন ব্যাখ্যা করে, আর কুরআন আমাদের অস্তিত্বের অর্থ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে।১৪০০ বছর আগে যখন না ছিল বিজ্ঞান,না ছিল গবেষণার কোনো ব্যাবস্থা তখন কুরআনে এই আয়াত নাযিল করেছেন মহাজ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ রব্বুল আলামিন।

ডারউইনের মানব বিবর্তনবান একটি জঘন্য মিথ্যাচার

মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। এরমধ্যে সবচেয়ে অগ্রহণযোগ্য ও বিজ্ঞান বহির্ভূত মতবাদ হচ্ছে "ডারউইনের মানব বিবর্তনবাদ" তত্ত্বটি। তার মতে বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জি প্রাণির শাখা প্রাণী হিসেবে মানুষের উৎপত্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা তার মতবাদ বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমানিত না হওয়ায় বাতিল করে দিয়েছেন । শুধুমাত্র কিছু নাস্তিক বিজ্ঞানী ও নামমাত্র বুদ্ধিজীবীরা এই তত্ত্বটি মেনে নিয়ে তার ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে আসছে। কিন্তু মানুষ এবং বানর, গরিলা, কিংবা শিম্পাঞ্জির মধ্যে বৈশিষ্ট্যগতভাবে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। মানুষের বিচারক্ষমতা, প্রজ্ঞা, বিবেক, বুদ্ধিমত্তা, আত্মশক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি, চিন্তাশক্তি, মস্তিষ্কের বিকাশ, নৈতিক বিকাশ প্রভৃতি গুণ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যা বানর, গরিলা ও শিম্পাঞ্জির মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ডারউইনের তত্ত্বটি যে অগ্রহনযোগ্য তার আরো একটি কারণ হচ্ছে-DNA। মানুষের DNA শুকর, বানর প্রভৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

"হে, মানবজাতি! তোমাদের প্রভুর অনুগত হও যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের দুজন থেকে বিস্তার করেছেন অগণিত নারী-পুরুষ।"

[সুরা নিসা: ০১]

আল্লাহ তায়ালা আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করার পর তাঁকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে সমস্ত সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন এবং তার থেকে একজন সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন। যার নাম হাওয়া (আঃ)।আদম (আঃ) সমগ্র মানবজাতির আদি পিতা এবং হাওয়া (আঃ) হলেন আদি জননী। তাঁদের দুজনের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর উভয়ের মিলনের ফলে হাওয়া (আঃ) এর গর্ভে সন্তান সৃষ্টি হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর সুন্দর মানবরুপে সেই সন্তান ভূমিষ্ট হয়। এভাবে বিশ্বময় গোটা মানবজাতি বংশবিস্তার করে চলেছে এবং মানব সৃষ্টির এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

"আল্লাহ তোমাদের নাফস থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়ের মধ্য থেকে পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ সরবরাহ করেছেন। অতএব, তাঁরা কি অযৌক্তিক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?"

[সুরা নাহলঃ ৭২]

উক্ত আয়াতে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ডারউইনের মানব বিবর্তনবাদ তত্ত্বটি সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিমূলক এবং অযৌক্তিক যার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

মানুষ বানরে রূপান্তরিত হওয়ার একটি ঘটনা কুরআনে উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ মিঃ ডারউইন সেই ঘটনাটি উল্টো করে নিজের মতো করে সাজিয়ে মানব বিবর্তনবাদ তত্ত্ব" বর্ণনা করেছে। যা মূলত দুর্বল ইমানের বা স্বল্প জ্ঞানের অধিকারি মুসলমানদের মাঝে নাস্তিকতা ছড়িয়ে দেওয়ার একধরনের ষড়যন্ত্র।

পাপের শাস্তি স্বরূপ যে ইয়াহুদীদের বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করা হয়েছিল বর্তমানের বানর ও শুকর তাদের বংশধর নয়। বানর ও শুকরে রুপান্তরিত ইয়াহুদীরা পৃথিবীতে মাত্র ৩ দিন জীবিত ছিল। কারণ- রূপান্তরিত কোন ব্যক্তি ৩ দিনের বেশি বাঁচেনা। তারা আহার করত না, পান করত না এবং তারা কোনো বংশধরও রেখে যায়নি। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন, যাকে যেমনভাবে ইচ্ছা তেমনভাবে রুপান্তরিত করেন।

মানব সৃষ্টি প্রক্রিয়া

মানব সৃষ্টির বিষয়টি কুরআনে অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে বর্ণিত হয়েছে, যা অধুনিক বিজ্ঞান ও ভ্রূণবিজ্ঞানের সাথে মিল রেখে চলে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে।
তারপর তাকে এক বিন্দু বীর্যররূপে স্থাপন করেছি নিরাপদ আশ্রয়ে। অতঃপর শুক্রবিন্দুকে করেছি জমাট রক্ত, তারপর মাংসপিন্ড, পরে হাড় সৃষ্টি করেছি এবং তা ঢেকে দিয়েছি মাংস দিয়ে। এরপর তাকে গঠন করেছি অন্য এক সৃষ্টি রুপে।"

[সুরা আল-মুমিনুন: ১২-১৪]

এই আয়াতগুলোতে মানর ভ্রূণের বিকাশের ধাপগুলো উল্লেখ করা হয়েছে:

১. নুতফাহ - শুক্রাণু ও ডিম্বানুর মিলনে নিষিক্ত ডিম্বাণু।

২. আলাকাহ - জমাট রক্ত বা ঝুলন্ত রক্ত যা গর্ভে নিজেকে আটকে রাখে।

৩. মুদগাহ - চিবানো মাংসপিন্ড সদৃশ ভ্রূণ।
৪. হাড় ও মাংসের গঠন- হাড় তৈরি হয়ে পরে মাংস দিয়ে আবৃত হয়।

৫. অন্য সৃষ্টিতে রূপান্তর- মানবীয় গঠন ও আত্মার সংযোজন।

আত্মার সংযোজন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

"অতঃপর তিনি তাকে পূর্ণ আকৃতি দিলেন এবং তাতে তাঁর রূহ ফুঁকে দিলেন। তিনি তোমাদেরকে দিলেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ; তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"

[সুরা সাজদা- ০৯]

এই আয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে "রুহ" ফুঁকে দেওয়া অর্থাৎ আত্মার সংযোজনের বিষয়টি বোঝায় যে, মানুষের মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক উপাদান রয়েছে- যা কেবল দেহ নয় বরং রূহ তথা আত্মার সমন্বয়ে মানুষকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি করেছে।

আধুনিক ভ্রূণবিজ্ঞান বলে, গর্ভাবস্থায় মানব ভ্রূণ ধাপে ধাপে বিকশিত হয় যা আল্ট্রাসাউন্ড বা মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে দেখা সম্ভব হয়েছে।

বিজ্ঞানী ড. কিথ এল. মুর, একজন খ্যাতনামা ভ্রূণ বিশেষজ্ঞ, বলেন যে, কুরআনের এই বর্ণনা আশ্চর্যজনকভাবে আধুনিক জীববিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এটি প্রমাণ করে, ১৪০০ বছর আগে কুরআনের মাধ্যমে মানব সৃষ্টির যেসব ধাপ বর্ণনা করা হয়েছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত সত্য — যা মানুষের পক্ষে সেই সময় জানার উপায় ছিল না।

মানবদেহ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য

মানবদেহের গঠন, আল্লাহ যে মহাশক্তির অধিকারী তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। আধুনিক অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, ও মলিকিউলার বায়োলজিও আল্লাহর সৃষ্টির অসাধারণতা স্পষ্ট করে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ
"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে।
তারপর তাকে এক বিন্দু বীর্যররূপে স্থাপন করেছি নিরাপদ আশ্রয়ে। অতঃপর শুক্রবিন্দুকে করেছি জমাট রক্ত, তারপর মাংসপিন্ড, পরে হাড় সৃষ্টি করেছি এবং তা ঢেকে দিয়েছি মাংস দিয়ে। এরপর তাকে গঠন করেছি অন্য এক সৃষ্টি রুপে।" অতএব
সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান!

[সূরা মু’মিনুন:১২-১৪]

এটি ভ্রূণবিকাশের পরপর ধাপগুলোর বর্ণনা দেয়—যা আজকের আধুনিক ভ্রূণতত্ত্ব (Embryology) এর সাথে মিলে যায়।

মানবজীবনের সূচনা একটি সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর প্রক্রিয়া। বীর্য (Sperm) মানব সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যার বর্ণনা পবিত্র কুরআনে ১৪০০ বছর আগে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এসেছে। আশ্চর্যজনকভাবে, আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির পর এখন এসব বর্ণনার সাথে মিল পাওয়া যাচ্ছে, যা কুরআনের অলৌকিকত্বের প্রমান দেয়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে মানব সৃষ্টি ও বীর্যের সূচনা নিয়ে একাধিক আয়াতে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

“তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে, যা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যবর্তী স্থান থেকে।”

[সুরা ত্বরিক : ৬-৭]

এখানে "সবেগে স্খলিত পানি" (ٍمَاءٍ دَافِقٍ) বলা হয়েছে, যা চলমান বা ছুটে বের হয় এমন তরল—যা স্পার্মের তথা বীর্যের বৈশিষ্ট্য।

“ মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যবর্তী স্থান” বলা হয়েছে, যা পুরুষের যৌনাঙ্গের মূল স্নায়ু ও উৎপত্তিস্থলের জায়গা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়।

বিজ্ঞানের আলোকে বীর্য হলো একধরনের তরল, যা শুক্রাণু (Spermatozoa), এনজাইম, পুষ্টিকর উপাদান ও তরল পরিবেশে মিশ্রিত হয়ে তৈরি হয়।
বীর্য তৈরি হয় অণ্ডকোষে (Testes), যেখানে প্রতিদিন প্রায় ১০-২০ কোটি শুক্রাণু তৈরি হতে পারে।

এক চমৎকার তথ্য হলো: প্রতি মিলিলিটার বীর্যে প্রায় ১৫-২০০ মিলিয়ন শুক্রাণু থাকে, কিন্তু গর্ভধারণের জন্য একটি মাত্র সঠিক শুক্রাণুই প্রয়োজন।ডিম্বাণুর সঙ্গে শুক্রাণু নিষিক্ত হলে Zygote তৈরি হয়।এরপর ধাপে ধাপে বিকাশ হয় ভ্রূণ (Embryo), যা কুরআনে জমাট রক্ত, মাংসপিণ্ড ইত্যাদি ধাপে বর্ণিত হয়েছে—যা আধুনিক Embryology এর গবেষণায় হুবহু মিলে গেছে।

বিশ্বখ্যাত ভ্রূণতত্ত্ববিদ Dr. Keith L. Moore বলেন: “কুরআনে মানব সৃষ্টির বিবরণ আশ্চর্যজনকভাবে আধুনিক ভ্রূণতত্ত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।”

বীর্য যে কীভাবে তৈরি হয়, কীভাবে তা মানব জন্মের সূচনা করে, তা কুরআনে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ গভীরভাবে বর্ণিত। বিজ্ঞানের আলোকে আজ আমরা জানি যে এই প্রক্রিয়া একটি নিখুঁত সিস্টেমের মাধ্যমে ঘটে, যেখানে সামান্যতম বিচ্যুতি মানবজন্মকে অসম্ভব করে তুলতে পারে।

কুরআনের বর্ণনা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি তা বিজ্ঞানের সত্যের সঙ্গে মিলে যাওয়াও কুরআনের এক অলৌকিক দিক।

বীর্যের সৃষ্টি শুধুমাত্র শারীরিক বা বৈজ্ঞানিক বিষয় নয়—এটি আল্লাহর সৃষ্টি শক্তির একটি জীবন্ত প্রমাণ। কুরআন ও বিজ্ঞান এই বিষয়ে একে অপরের পরিপূরক ব্যাখ্যা দেয়, যা আমাদেরকে বিশ্বাস, বিস্ময় ও উপলব্ধিতে এক নতুন দিগন্তে নিয়ে যায়।
মানবদেহের ধাপে ধাপে সৃষ্টি আল্লাহর নির্ভুল পরিকল্পনার প্রমাণ।মহান আল্লাহ বলেনঃ

"তোমরা কি নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করো না, কিভাবে সৃষ্টি হয়েছো?"
[সূরা আয-যারিয়াত: ২১]

মহান আল্লাহ আরও বলেছেনঃ

"তুমি বলো: তিনি-ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় বানিয়েছেন। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"

[সূরা আল-মুলক: ২৩]

মানুষ সম্পর্কে এমন বহু আয়াত আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন এবং এ বিষয়ে চিন্তা করতে বলেছেন।
বিজ্ঞানীদের করা গবেষণার তথ্য অনুযায়ীঃ
>হৃদপিণ্ড প্রতি দিন প্রায় ১ লক্ষ বার ধ্বনি তোলে এবং ৭,৫০০ লিটার রক্ত পাম্প করে ।
>মস্তিষ্ক ৮৬ বিলিয়ন নিউরন, প্রতি সেকেন্ডে লাখো তথ্য প্রক্রিয়া করে।
>চোখ ৫৭৬ মেগাপিক্সেল রেজোলিউশন; আলোর পার্থক্য চেনে ১/১০০০ সেকেন্ডে।

>DNA একটি কোষেই ৩ বিলিয়ন জেনেটিক "লেটার", যা বইয়ে লিখলে হাজার হাজার খণ্ড হতো।
>কিডনি দিনে ৫০ গ্যালনের বেশি রক্ত ছেঁকে ১.৫ লিটার মূত্র তৈরি করে।
>নিউরো-এন্ডোক্রাইন সিস্টেম: নিজে নিজেই হরমোন ও প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।
>ইমিউন সিস্টেম: শরীরে অনুপ্রবেশকারী ভাইরাসকে শনাক্ত করে ধ্বংস করে
>থার্মো-রেগুলেশন: শরীর গরম বা ঠান্ডা হলে নিজে নিজে স্বাভাবিক রাখে

এত জটিল কাজ একসাথে, নিখুঁতভাবে হচ্ছে কোনো বাহ্যিক রিমোট কন্ট্রোল ছাড়াই!

এতোগুলো সিস্টেমের মধ্যে যদি নিউরনের গঠন ও কাজকে একটু আলোচনা করি তাহলে দেখতে পায়:

নিউরন তথ্য গ্রহণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ করে।এটি বৈদ্যুতিক সংকেত (action potential) আকারে কাজ করে।নিউরনের মাধ্যমে অনুভূতি, চিন্তা, স্মৃতি, চলন—সবকিছু পরিচালিত হয়। যদিও কুরআনে “নিউরন” শব্দটি ব্যবহার হয়নি, তবে মানুষের চিন্তা, উপলব্ধি, অনুভূতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সম্পর্কে অনেক আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে, যেগুলো নিউরনের কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

"তিনি তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"
[সুরা আল-মু’মিনুন : ৭৮]

এই আয়াতে শ্রবণ, দৃষ্টি ও বোধ–তিনটি প্রধান ইন্দ্রিয় এবং চিন্তা প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে। এগুলো পরিচালিত হয় নিউরনের মাধ্যমে।

"অতঃপর তিনি তাকে সুগঠিত করলেন এবং তাতে নিজের রূহ ফুঁকে দিলেন; এবং তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, দৃষ্টি এবং হৃদয় দান করলেন। তোমরা কমই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।"

[সুরা আস-সাজদা :৯]

এই আয়াত মানব মস্তিষ্কের জটিল প্রক্রিয়া এবং আত্মার যোগসূত্র ব্যাখ্যা করে, যেখানে নিউরন চিন্তা ও অনুভূতির বাহক হিসেবে কাজ করে।

"তাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির মতো, যাকে ডাকা হয়, কিন্তু সে কেবল ডাক ও আহ্বান ছাড়া কিছুই শুনতে পায় না। তারা বধির, মূক ও অন্ধ—তারা কিছুই বুঝে না।"

[সুরা আল-বাকারা :১৭১]

এখানে বোঝার অক্ষমতা বোঝাতে 'বধির, মূক ও অন্ধ' বলা হয়েছে, যা নিউরনের অকার্যকারিতা বা বিকল অবস্থার সঙ্গে মিলে যায়।

কুরআন নিউরনের মতো জটিল বিষয় সরাসরি উল্লেখ না করলেও, মানব মস্তিষ্ক, চিন্তা, অনুভূতি ও উপলব্ধি সংক্রান্ত যে ব্যাখ্যা দেয়, তা আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞানের (neuroscience) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ তো শুধুমাত্র মানবদেহের একটি সিস্টেম নিয়ে আলোচনা। দেহের বাকি সিস্টেমগুলোর গঠন ও কাজ পর্যালোচনা করলে মহান আল্লাহর সৃষ্টির নিপুণতা দেখে বিস্ময়বোধ করা ছাড়া উপায় নায়।

মহান আল্লাহ আরও বলেন:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ. بَلَى قَدِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّى بَنَابَه.ُ

"মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার হাড়গুলোকে সংযোজন করতে পারব না?প্রকৃতপক্ষে আমি তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত যথাযথভাবে সুবিন্যস্ত করতে সক্ষম।”
[সুরা ক্বিয়ামাহ : ৩-৪]

মৃত ব্যক্তির অস্থি পঞ্জর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর পুনরুত্থান ঘটার ও বিচার দিবসে কিভাবে প্রত্যেককে সনাক্ত করা সম্ভব হবে- এ ব্যাপারে অবিশ্বাসীগণ বিতর্ক করে থাকে। এ প্রশ্নের উত্তর সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন- তিনি কেবলমাত্র অস্থি-পঞ্জরকেই শুধু সংযোজিত করবেন না বরং আমাদের আঙ্গুলের রেখাসমূহকেও (আঙ্গুলের ছাপকে) তিনি নিখুঁতভাবে পুনরায় তৈরী করবেন।

ব্যক্তি পরিচয় স্থিরকরনের বিষয় বলতে গিয়ে কেন কুরআন সুনির্দিষ্টভাবে আঙ্গুলের অগ্রভাগের কথা বলল? স্যার ফ্রান্সিস গোল্ট (Sir Francis Golt) এর গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, ১৮৮০ সালে মানুষ সনাক্তকরণে আঙ্গুলের ছাপকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হয়। সারা বিশ্বে এমন দু'জন ব্যক্তি নেই যাদের আঙ্গুলের ছাপের ধরন হুবহু একই। এমনকি একই রকমের যমজ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও হয় না। এ কারণে বিশ্বব্যাপী সকল পুলিশ বাহিনী অপরাধী সনাক্তকরণে আঙ্গুলের ছাপ ব্যবহার করে থাকে।

১৪০০ বছর পূর্বে প্রত্যেক ব্যক্তির আঙ্গুলের ছাপের স্বতন্ত্রতাকে কে জানত? অবশ্যই স্বয়ং স্রষ্টা ব্যতীত আর কেউই জানত না।

পূর্বে মনে করা হতো যে, অনুভূতি ও বেদনার জ্ঞানোন্দ্রিয় কেবলমাত্র মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, ব্যথা বেদনায় সাড়াদানকারী গ্রন্থি বা কোষসমূহ (Pain receptors) চামড়ার মধ্যে রয়েছে। এগুলো ব্যতীত কোন ব্যক্তি ব্যথা-বেদনা অনুভব করতে পারে না।যখন একজন ডাক্তার অগ্নিদগ্ধে আক্রান্ত কোন রোগীকে পরীক্ষা করেন তখন তিনি সরু পিন

দ্বারা পোড়ার মাত্রা নিরূপণ করেন। যদি রোগী ব্যথা অনুভব করে তাহলে ডাক্তার খুশী হন। কারণ রোগীর বেদনার অনুভূতি প্রমাণ করে পোড়ার ক্ষতটি অগভীর ও সামান্য এবং ব্যথা বেদনায় সাড়াদানকারী গ্রন্থি বা কোষসমূহ (Pain receptors) অক্ষত আছে। পক্ষান্তরে রোগী যদি কোন ব্যথা বেদনা অনুভব না করেন, তাহলে রোগীর এই অনুভূতিহীনতাই ইঙ্গিত করে যে, পোড়াটা গভীর এবং গ্রন্থি বা কোষসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে।

আল-কুরআনের নিম্নের আয়াতটি ব্যথায় সাড়াদানকারী গ্রন্থি বা কোষের অস্তিত্বের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَيْتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا. كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْتُهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا.

"যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করে তাদেরকে আমি অবশ্যই নিক্ষেপ করব আগুনে। আর যখনই তাদের চামড়া জ্বলে পুড়ে যাবে তখন তা আমি পাল্টে দেব নূতন চামড়া দিয়ে, যাতে তারা শাস্তি আস্বাদন করতে পারে পূর্ণমাত্রায়। আল্লাহ পরাক্রশালী ও প্রজ্ঞাময়।"

[সুরা আন - নিসা : ৫৬]

থাইল্যান্ডের 'চিয়াং মাই বিশ্ববিদ্যালয়ের' এ্যানাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাগাতাত তেজাসেন (Prof Tagatat Tejasen) Pain receptors-এর উপর গবেষণায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। প্রথমে তিনি বিশ্বাস করতে চাননি যে কুরআন ১৪০০ বছর পূর্বে এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি উল্লেখ করেছে। পরবর্তীতে কুরআনের এই বিশেষ আয়াতটির অনুবাদ পরীক্ষা করেন। অধ্যাপক তেজাসেন কুরআনের এই আয়াতটির বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতায় এতটা অভিভূত হয়ে পড়েন যে, রিয়াদে অনুষ্ঠিত "কুরআন ও সুন্নাহর বৈজ্ঞানিক নিদর্শনাবলী" বিষয়ের উপর ৮ম সৌদী মেডিকেল কনফারেন্সে সকলের উপস্থিতিতে ঘোষণা করেন-

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

'আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল।'

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ আরও বলেছেনঃ

"তিনি যে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আবার তা পুনরায় করতে সক্ষম। আর এ কাজ তাঁর জন্য অতি সহজ।"
[সূরা রূম: ২৭]

মানুষ নিজেকে দেখলেই বুঝতে পারে, এই সূক্ষ্ম এবং ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামো কোনো দৈব বা এলোমেলো বিকাশ নয়, বরং এক মহাশক্তিধর সৃষ্টিকর্তার নিখুঁত কারিগরি। মানবদেহ হলো জ্যান্ত নিদর্শন, যা দিনরাত বলে যাচ্ছে:
"এই সৃষ্টি এমন কোনো দুর্ঘটনা নয়, বরং এক মহান স্রষ্টার নিখুঁত কৌশল।" তবুও কি আমরা সেই স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো না??

রূহ বনাম বিজ্ঞান

"রূহ" বা আত্মা মানব অস্তিত্বের এক রহস্যময় দিক। মানুষ কেবল মাটি দিয়ে গঠিত নয়, বরং একটি অদৃশ্য, অশরীরী সত্তা—"রূহ" দ্বারা সে জীবিত হয়। কুরআনে রূহ সম্পর্কে বলা হলেও এর পূর্ণ রহস্য আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। অন্যদিকে, আধুনিক বিজ্ঞান আত্মার অস্তিত্ব বা কার্যকারিতা নিয়ে কিছু গবেষণা করেছে, তবে এখনও এটি এক গভীর রহস্য হিসেবে থেকে গেছে।

"তারা তোমার কাছে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, রূহ আমার প্রতিপালকের নির্দেশ মাত্র; এবং তোমাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে খুবই সামান্য।"
[সূরা আল-ইসরা :৮৫]

এই আয়াত প্রমাণ করে, রূহ এমন এক বিষয় যা মানুষের জ্ঞানের সীমার বাইরে।অর্থাৎ রুহ সম্পর্কে জানতে হলে যে পরিমাণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন বা সিস্টেম মানুষের মধ্যে থাকা প্রয়োজন তা মানুষের নেই।এতে রয়েছে মহান আল্লাহর এক বিরাট হিকমত। এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলো সম্পর্কে কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালা ই জানেন। অন্য কারো পক্ষে সে সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়।যেমনঃ কিয়ামত কখন হবে এর জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই আছে।তেমনি রুহ এর জ্ঞানও শুধুমাত্র আল্লাহর নিকট রয়েছে।

রূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এক ধরণের আদেশ বা শক্তি, যা মানুষকে জীবন্ত করে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

"অতঃপর তিনি তাকে পূর্ণ আকৃতি দিলেন এবং তাতে তাঁর রূহ ফুঁকে দিলেন। তিনি তোমাদেরকে দিলেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ; তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"
[সুরা সাজদা- ০৯]

এটি থেকে বোঝা যায়, শরীর গঠনের পর রূহ দেওয়া হয় এবং তবেই মানুষ "জীবন্ত" ও "বুদ্ধিমান" হয়।

রূহের বৈশিষ্ট্য:

অদৃশ্য ও অতীন্দ্রিয়।
মৃত্যুতে শরীর থেকে আলাদা হয়।
কিয়ামতের দিনে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

আধুনিক বিজ্ঞান সরাসরি "আত্মা" বলতে কিছু চিহ্নিত করতে পারেনি। আর এখানেই "এবং তোমাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে খুবই সামান্য" এই আয়াতের সত্যতা প্রমাণিত হয়।যেহেতু মানুষকে খুবই সামান্য জ্ঞান দেওয়া হয়েছে সেকারনেই মূলত বিজ্ঞানীরা রুহ তথা আত্মা আবিষ্কারে সক্ষম হয়নি। তবে কিছু গবেষক মন (mind), চেতনা (consciousness) ও জীবনশক্তিকে "আত্মার" সঙ্গে তুলনা করে থাকেন।

কিছু বিজ্ঞানী, যেমন Stuart Hameroff এবং Roger Penrose, ধারণা দেন যে মানুষের চেতনা (যা আত্মার কাছাকাছি) কোয়ান্টাম লেভেলে কাজ করে। অর্থাৎ, এটি কেবল নিউরনের ক্রিয়া নয়, বরং আরও সূক্ষ্ম স্তরে ঘটে।

Near-Death Experience (NDE):
মৃত্যুর কাছাকাছি অবস্থায় (যেমন: হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর) অনেক মানুষ আলো দেখা, শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে। এসব অভিজ্ঞতা আত্মার অস্তিত্বের এক সম্ভাব্য ইঙ্গিত দেয়।

২১ গ্রাম গবেষণা (Dr. Duncan MacDougall):
এক মার্কিন চিকিৎসক চেষ্টা করেছিলেন প্রমাণ করতে যে, মৃত্যুর সময় শরীর ২১ গ্রাম হালকা হয়ে যায়—যা তিনি আত্মার ওজন বলে দাবি করেছিলেন। যদিও এই গবেষণা আজ আর বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, তবুও এটি আত্মা নিয়ে বিজ্ঞানের আগ্রহের উদাহরণ।

রূহ বা আত্মা এমন একটি বিষয়, যা আজও মানুষের জ্ঞানের বাইরে রয়ে গেছে। কুরআনে এটিকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এক রহস্যময় শক্তি বলা হয়েছে, যা মানুষের অস্তিত্বকে প্রাণ দেয়। বিজ্ঞানের আলোচনায় চেতনা, মন এবং আত্ম-উপলব্ধি নিয়ে নানা গবেষণা হলেও রূহের প্রকৃত স্বরূপ এখনো অস্পষ্ট।

আত্মা হয়তো এমনই এক জগৎ যা আল্লাহর ইচ্ছায় কিছুটা প্রকাশিত, বাকিটা মানব সীমার বাইরে—যার স্বরূপ আমরা শুধু কুরআন থেকে আংশিকভাবে জানতে পারি।

স্বামী - স্ত্রীর ভালোবাসার রহস্য

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।অর্থাৎ নারী ও পুরুষরূপে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অনেকে প্রশ্ন, করেন- পৃথিবীতে যদি শুধু নারী থাকতো, কোনো পুরুষ না থাকতো তাহলে কি পৃথিবীটা অনেক শান্তির হতো না? অথবা আল্লাহ যদি মানুষকে লিঙ্গবিহীন প্রাণী হিসেবে তৈরি করতেন, যেখানে সবাই নিজে থেকেই বাচ্চা জন্ম দিতে পারতো, যেমন: কিছু কিছু প্রানি পারে, তাহলে কি সত্যিই কোনো সমস্যা হতো? তখন নারী-পুরুষের দ্বন্দ্ব, সংসারে ঝামেলা, অশান্তি, অশ্লীলতা, ব্যভিচার, ধর্ষণ ইত্যাদি মানবজাতির অর্ধেকের বেশি অপরাধ কখনো হতো না! তাহলে এখন নারী-পুরুষ সৃষ্টি এবং স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার সম্পর্ক নিয়ে কুরআন ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আলোচনা করা যাক। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলেন,

"আমি তোমাদেরকে জোড়ায়- জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।"

[সুরা নাবা: ০৮]

অর্থাৎ মানুষকে নারী ও পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। বিপরীত লিঙ্গ তৈরির পেছনে কী বিরাট উদ্দেশ্য রয়েছে তা সুরা রূমে আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন,

"তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি হলো তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের সহধর্মী সৃষ্টি করেছেন- যেন তোমরা তাদের কাছে শান্তি পেতে পারো এবং তিনি তোমাদের ভেতর একে অন্যের প্রতি ভালোবাসা এবং দয়া দিয়েছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য বিরাট নিদর্শন রয়েছে।"

[সুরা রূম : ২১]

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবার নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করছেন, পুরুষ এবং নারী তৈরি করা হয়েছে যেন এরা

একে অন্যের কাছে শান্তি খুঁজে পেতে পারে। অনেক স্বামী জানেন এই অভিজ্ঞতাটা কেমন। সারাদিনের ক্লান্তি, শত দুশ্চিন্তার মধ্যে অস্থির হয়ে শুয়ে থাকার সময় স্ত্রী যখন কাছে এসে আলতো করে হাত ধরে, একটু গা গেসে বসে, তখন কী যেন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। সমস্ত অস্থিরতা হঠাৎ করে উধাও হয়ে যায়। দুশ্চিন্তাগুলো কিছুক্ষণের জন্য গায়েব হয়ে গিয়ে মনটা শান্ত হয়ে যায়। শরীরের ক্লান্তিও যেন কমে যেতে থাকে। অথচ স্ত্রী কিছুই বলেনি বা কিছুই করেনি। সামান্য একটু সঙ্গ, একটু স্পর্শই যথেষ্ট দুনিয়ার শত সমস্যা কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়ে স্বামীকে শান্তি এনে দেওয়ার জন্য। একই অনুভূতি স্ত্রীদের বেলায়ও হয় তারা যখন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকেন, ঘর-সংসার-কাজের হাজারো দায়িত্বে কারও মন জয় করতে না পেরে কুলকিনারা হারিয়ে দিশেহারা অবস্থায় থাকেন তখন স্বামীর একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া একটা গভীর ভালোবাসার আলিঙ্গন মুহূর্তের মধ্যে স্ত্রীকে সব ভুলিয়ে দিয়ে অদ্ভুত এক শান্তির জগতে ডুবিয়ে দেয়।

৪০৪ জন প্রাপ্তবয়স্কের উপর গবেষণায় দেখা গেছে, যারা ১৪ দিন নিয়মিত প্রতিদিন একে অন্যকে আলিঙ্গন করেছিল, তাদের মধ্যে মনোমালিন্য এবং ঝগড়াঝাটি উল্লেখযোগ্য হারে কম হয়েছিল। শুধু তাই না, যেদিন তাদের মধ্যে মনোমালিন্য বা ঝগড়া ঝাটি হয়েছিল সেদিন যারা শেষ পর্যন্ত এককেে অন্যকে আলিঙ্গন করেছিল, তাদের পরবর্তীতে সমস্যা আরোও প্রকট হবার পরিমান অন্যদের থেকে অপেক্ষাকৃত কম হয়েছিল।

এই গবেষণার উপসংহার হচ্ছে: স্বামী-স্ত্রী নিয়মিত একে অন্যকে আলিঙ্গন করলে শুধু যে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য এবং ঝগড়া কম হবে তাই-ই নয়, সেরকমম কিছু হয়ে গেলেও আলিঙ্গন তার ক্ষতিকর প্রভাব এবং পরবর্তীতে তা আরও জটিল হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমিয়ে দেবে।এগুলোর পেছনে জটিল বৈজ্ঞানিক কারন রয়েছে। আল্লাহ এমনিতেই বলেননি যে, এর মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য বিরাট নিদর্শন রয়েছে। বহু গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে, যখন আমরা একে অন্যকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করি তখন বুকে-পেটের মধ্যে যে চাপ পড়ে এবং জড়িয়ে ধরে পিঠে হাত দিয়ে করে উপর-নিচ করার কারণে শরীরের বিশেষ কিছু স্নায়ুতে যে

চাপ পড়ে, তা থেকে আমাদের মস্তিষ্কে বিশেষ কিছু সিগন্যাল যায় যা মস্তিষ্ক থেকে অক্সিটোসিন নিঃসরণ করে।এই অক্সিটোসিন শরীরে ছড়িয়ে গিয়ে এমন কিছু হরমোন নিঃসরণ করে যা মানসিক চাপ, অবসাদ কমিয়ে দেয়, শরীরে প্রদাহ নিয়ন্ত্রণ করে, উচ্চরক্তচাপ কমিয়ে দেয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত যে রোগীগুলোকে মায়া-মমতা দিয়ে হাত ধরা হয় এবং আলিঙ্গন করা হয়, তারা অন্য রোগীদের থেকে দ্রুত সুস্থ হয়। আর একই অসুখের জটিলতা তাদের গড় পড়তায় কম হয়।ফলে নিয়মিত যে দম্পতি একে অন্যকে আলিঙ্গন করে। হাত বুলিয়ে আদর করে তাদের মধ্যে জটিল সমস্যা হওয়ার পরিমান উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়, সমস্যার পুনরাবৃত্তি কম হয় এবং তারা উভয়েই শারীরিক এবং মানসিকভাবে ভাবে অপেক্ষাকৃত বেশি ভালো থাকে। বিশেষ করে নারীদের উচ্চ রক্তচাপ কমাতে আলিঙ্গন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ নিয়ে আলাদাভাবে করা গবেষণার চমৎকার ফলাফল পাওয়া গেছে। গত ৫০ বছরে বহু গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষের মানুষিক সুস্থতার উপর বিয়ে একটি বিরাট ভূমিকা রাখে। হতাশা, অবসাদসহ নানা ধরনের জটিল মানুসিক সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া নারী-পুরুষদের উপর পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা কাছে: বিবাহিত নারী পুরুষের এমন সমস্যা অবিবাহিতদের থেকে উল্লেখযোগ্য হারে কম। বিশেষ কিছু গবেষনায় এটাও বেরিয়ে এসেছে, অবিবাহিত সম্পর্ক যেমন- ডেটিং, লিভটুগেদার মোটেও বিবাহিত সম্পর্কের মতো একইরকম কল্যাণকর নয়। এমনকি পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে যেখানে লিভটুগেদারকে গ্রহণযোগ্য করে ফেলা হয়েছে, সেখানেও নারী-পুরুষের মানুষিক সুস্থতার উপর বিয়ে কিছুটা হলেও বেশি ভূমিকা রাখে। আবার কয়েক যুগ পর্যন্ত একটি ধারণা ছিল, বিয়ের ফলে শুধু পুরুষের উপকার বেশি হয় নারীর বরং সমস্যা বেশি হয়। এই ধারণা পরবর্তীতে গিয়ে ভুল প্রমানিত হয়েছে। বিয়ের ফলে নারী-পুরুষ উভয়ের প্রায় সমান উপকার হয়। আল্লাহ তায়ালা স্বামী-স্ত্রীর ভেতর এক বিশেষ ধরনের ভালোবাসা এবং দয়া তৈরি করে দিয়েছেন। কেউ যদি যথাসাধ্য ইসলামের নিয়ম মেনে পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রাখেন তাহলে আশা করা যায়, আল্লাহ সেই দম্পতির মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি এনে দেবেন এবং দুনিয়ার পরীক্ষাগুলো তারা দু'জনে একসাথে সুন্দরভাবে পার করতে পারবেন। তবে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অত্যন্ত

আল্লাহভীরু হলেই যে সংসার সুখের হবে, সেই নিশ্চয়তাও নেই। সাহাবিদের ভেতরেও দাম্পত্য সমস্যা ছিল যা তালাক পর্যন্ত গড়াত। শুধু মনে রাখতে হবে, বিপরীত লিঙ্গ তৈরির উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন তারা একে অন্যের কাছে শান্তি খুঁজে পেতে পারে। শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হওয়া আরও অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। অনেকে যদিও দাবি করেন, এই আয়াতে "আযওয়াজ" মানে বিবাহিত হতে হবে, সেটা বাধ্য নয়। আরবিতে অবিবাহিত জোড়াকেও "আযওয়াজ" বলা হয়। তাই বিয়ে করাটা শান্তি পাওয়ার শর্ত নয়। যারা এরকম ভাবেন, তাদের কুরআনের অন্য আয়াতগুলো, যেখানে "আওয়াজ" তথা স্ত্রী এবং দাসীদের পরিষ্কারভাবে আলাদাভাবে উল্লেখ করা আছে। এ ব্যাপারে কিছু পরিসংখ্যান দেখা যেতে পারে।

বিবাহিত বনাম বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক: পাশ্চাত্যে এবং আফ্রিকার দেশগুলোতে একাধিক গবেষনায় দেখা গেছে, বিবাহিত পরিবারে শারীরিক হিংস্রতার পরিমাণ ডেটিং এবং লিভটুগেদার করা পরিবার থেকে উল্লেখযোগ্য হারে কম। যেমন; বিবাহিত নারীদের থেকে অবিবাহিত নারী-যারা ডেটিং এবং লিভটুগেদার করছেন তারা ২.১গুন বেশি শারীরিক আঘাতের শিকার হন, যা মূলত হয় মাথা, ঘাড় এবং মুখমণ্ডলে। যদিও সেসব অবিবাহিত নারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবাহিত নারীদের থেকে গড় বেশি। এই অবিবাহিত নারীদের শরীরের একাধিক স্থানে আঘাত পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরিমাণ বিবাহিত নারীদের দ্বিগুণ বরং একাধিকবার পুরুষ সঙ্গীর আক্রমণের শিকার হয়ে হাসপাতালে আসার সংখ্যা বিবাহিত নারীদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুন। এই পরিসংখ্যান বের হয়েছে ৫ বছর ধরে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া নারীদের উপর গবেষণা থেকে। আমেরিকায় বিবাহ-বহির্ভূত দম্পতির সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়ে যাওয়ার পর আরেকটি গবেষণায় একই তথ্য বেরিয়ে আসে।

পরিশেষে বলা যায়, আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে বিপরীত লিঙ্গ তথা নারী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন এবং বিবাহের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একে অন্যের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যেন তারা একে অপরের কাছে শান্তি খুঁজে পায়। আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে নারী-পুরুষ সৃষ্টির যৌক্তিকতা বোঝা এবং স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালোবাসা উপভোগ করার তাওফিক দান করুন, আমিন!

স্তন্যপানকাল ২ বছর

পবিত্র কুরআনে মহার আল্লাহ বলেন:

"মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে—যে ইচ্ছা করে স্তন্যপানকাল পূর্ণ করতে।"
[সূরা আল-বাকারা :২৩৩]

এই আয়াতে "পূর্ণ দুই বছর" বলা হয়েছে, যা বুঝায় যে দুধ পান করানোর স্বাভাবিক ও সুপারিশকৃত সময়সীমা ২৪ মাস পর্যন্ত। এর পর দুধ পান করানোকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, যদিও একেবারে হারাম বলা হয়নি। তবে ইসলামিক ব্যাখ্যায় এটি প্রাকৃতিক সীমা—যার বাইরে মাতৃদুগ্ধের উপযোগিতা ও শিশুর প্রয়োজন কমে যায়।

বিজ্ঞানের আলোকে ,শারীরিক চাহিদা অনুযায়ী দুধের প্রয়োজন ফুরায়। ৬ মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ শিশুর একমাত্র খাবার হওয়া উচিত। ৬–২৪ মাস বয়সে, দুধের পাশাপাশি অন্যান্য খাবার শুরু হয় (complementary feeding)। ২ বছর পর শিশুর হজমশক্তি এবং পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা এমন হয় যে শুধুমাত্র দুধ তা পূরণ করতে পারে না ।মাতৃদুগ্ধের পুষ্টিগুণ ধীরে ধীরে কমে যায়। ২ বছর পর মায়ের দুধে থাকা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইমিউন উপাদান হ্রাস পায়। দুধ তখনও উপকারী, কিন্তু শিশুর চাহিদা পূরণের জন্য তা আর যথেষ্ট নয়। ২ বছরের পরও মাতৃদুগ্ধে অতিরিক্ত নির্ভরতা শিশুর স্বাধীন খাওয়ার অভ্যাস গড়ার পথে বাধা হতে পারে। শিশুর সামাজিক বিকাশ দেরিতে শুরু হয়, কারণ খাওয়ার সময় অন্যদের মতো খাবার না খেলে সে পিছিয়ে পড়ে।
দীর্ঘসময় দুধ পান করালে মায়ের শরীর অতিরিক্ত চাপ পড়ে—বিশেষ করে যদি তিনি আবার গর্ভবতী হন। অনেক সময় মায়ের হাড়ের ক্যালসিয়াম ঘাটতি দেখা দেয়।

অতএব,ইসলামে ২ বছর পূর্ণ দুধ পান করানো সুন্নাহ ও প্রাকৃতিক সীমা। এরপর বন্ধ করা উত্তম।

বিজ্ঞানও সেটাই বলছে,২ বছরের পর শিশুর জন্য সম্পূরক খাবার প্রয়োজনীয়, শুধুমাত্র দুধ যথেষ্ট নয়।

আল ইসরা ওয়াল মিরাজ

আল ইসরা ওয়াল মিরাজ ছিল রাসুল (সা:) এর প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা ও সম্মানের অশেষ নিদর্শন এবং পৃথিবীর সকল আনুষের জন্য এটি একটি বিস্ময়ার ঘটনা। এই মিরাজের ঘটনার মধ্যে অন্যতম বিষয় হলো সময়ের অকল্পনীয় সংকোচন। যদিওবা নবী করীম (সাঃ) এর এই মিরাজের ভ্রমণের বিষ্ময়কর মাহাত্য রয়েছে যেগুলোর বিশ্লেষণ বর্ণনা স্বল্প সময়ে তো নয় - ই বরং আজীবন বর্ণনা বা বিশ্লেষণ করে শেষ করা সম্ভব নয়। এই ঘটনা পুরোপুরি ব্যাখ্যা করার সক্ষমতা মানুরজাতি অর্জন করতে পারেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত অর্জন করতে পারবেনা। কারণ এই ঘটনার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার অকল্পনীয় অলৌকিকতা। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

"পরম মহিমাময় সত্তা তিনি; যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমন করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।

[সুরা বনি ইসরাইল: ০১]

নবীজি (সাঃ) এর মিরাজের ঘটনা ছিল এমন- তিনি মেরাজের রাতে 'বুরাকে" চড়ে ভ্রমণ করেছিলেন। "বুরাক" হলো একটি ঘোড়া ও গাধার মাঝামাঝি আকারের সাদা রঙের প্রানি। "বুরাক'' শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ "বারকুন" থেকে যার অর্থ "বিদ্যুৎ"। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আমার চোখের শেষ সিমানা সেখানে পতিত হচ্ছে বুরাক তার পূর্বেই মুহূর্তেই সেখানে পৌঁছে যাচ্ছে। সুতরাং এ থেকে সুস্পষ্ট যে বুরাক আল্লাহ তায়ালার এক অনন্য সৃষ্টি ছিল।

এখন রসুল (সাঃ) এর বর্ণনামতে, তাঁর দৃষ্টির শেষ সীমানা যেখানেই পড়েছে বুরাক মুহূর্তেই সেখানে উপস্থিত হচ্ছে। সুতরাং প্রশ্ন দাঁড়ায় নবী (সাঃ) তাঁর দৃষ্টি দিয়ে আসমানের সীমানা কতটুকু দেখতে পেয়েছিলেন? বিষয়টির যথাযথ উপলব্ধির

জন্য তার পূর্বে আমরা সাধারণ মানুষেরা কতটুকু দেখতে পাই সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া জরুরী। আমাদের দৃষ্টির সীমার দূরত্ব সম্পর্কে মূল বিষয়টি জানলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। আমরা

রাতের আকাশের কাছাকাছি থাকা উজ্জ্বল তারাগুলোকে সুস্পষ্ট দেখার পাশাপাশি অতি ক্ষীণ আবছা আবছা কিছু তারাকে সুদূর দূরত্বে দেখতে পাই। বিজ্ঞানীরা বলছেন, রাতের আকাশে আমাদের চোখে দৃশ্যমান আবছা আবছা তারাগুলোর মধ্যে থাকে আমাদের হোম গ্যালাক্সি মিল্কিওয়ের সুদূর দূরত্বে অবস্থানকারী প্রতিবেশী গ্যালাক্সিগুলো পর্যন্ত। অথচ আমরা যে গ্যালাক্সিতে রয়েছি বা আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ব্যাসই হচ্ছে এ পর্যন্ত জানামতে এক লক্ষ আলোকবর্ষ। আর আমাদের প্রতিবেশী এন্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি আমাদের কাছ থেকে ২৬ লক্ষ ৫০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে। সুতরাং এবার ভাবার বিষয় যে আমরা আমাদের খালি চোখে এক পলকে বা এক সেকেন্ডের চারভাগের একভাগ সময়ে এতোদূরে অবস্থিত বস্তুসমূহকেও অবলীলায় দেখতে পায়। যে আলোর গতিতে বা সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিলেও সে বস্তুর কাছে যেতে ২৬ লক্ষ বছরেরও বেশি সময় লাগবে। এটা আমাদের মতো সাধারন মানুষের চোখের ক্ষমতার কথা। তাহলে আমাদের চাইতে Extraordinary একজন মানুষ যিনি মহান আল্লাহ কর্তৃক ঐশ্বরিক ক্ষমা প্রাপ্ত সেই নবী (সাঃ) তিনি তাঁর চোখে কতদূর দেখতে পেতেন!নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে আরো কম সময়ে আরো বেশি দূরে বস্তুসমূহকে দেখতে পেতেন। আর মিরাজের রাতে উর্ধ্বাকাশ ভ্রমণে বুরাকের গতি এতোটাই কল্পনাতীত ছিল যে রসূল (সাঃ) এর দৃষ্টির শেষ সীমা যেখানে পতিত হতো সেখানে মুহূর্তেই বুরাক উপস্থিত হতো। সুতরাং সবকথার উপসংহার হলো- বুরাক সেকেন্ডের কোটিভাগের একভাগ সময়ে কোটি কোটি কিলোমিটার আলোকবর্ষ পথ অতিক্রম করেছিল এবং এভাবে হয়ে মিনিটের মধ্যেই বুরাক দ্বারা রসুল (সা:) প্রথম হতে সপ্তম আসমান পেরিয়ে মহান আল্লাহর দীদারে মিলিত হয়েছিলেন। আর প্রতিটি আসমানে অন্যান্য নবী-রসুলদের সাথে সাক্ষাৎ এবং তাদের সাথে সালাত আদায়ের বিষয়গুলোও উক্ত সময়ের সংকোচনের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং মেরাজের রাত্রে স্বল্প সময়ে এই ঘটনাটি পৃথিবীবাসীর দৃষ্টিতে An Extreme Compression of Time বা সময়ের অকল্পনীয় সংকোচন হলেও

পৃথিবীর বাইরের জগতের জন্য এই বিষয়টি ছিল স্বাভাবিক। ঠিক কিভাবে বা কোন কারণে? তার একমাত্র কারণ ছিল রসূল (সা.) এর অকল্পনীয় গতি যার বিষয়ে আমরা এতোক্ষণ বিস্তারিত আলোচনা করলাম।

সর্বোপরি পৃথিবীর আপামর ইসলাম ধর্মের অনুসারী এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত পোষণ করেন না তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে। আর স্রষ্টায় অবিশ্বাসীদের কাছেও এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় যদি তারা গতি এবং সময়ের মধ্যেকার রহস্যের বিষয়টি বিজ্ঞানের আলোকে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে থাকেন। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে আল ইসরা ওয়াল মিরাজের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের তৌফিক দান করুন,(আমিন)

সমকামিতা বনাম এইডস

AIDS এর পূর্ণনাম হচ্ছে- Acquired immune deficiency syndrome। এটি HIV ভাইরাসের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়।এ ভাইরাসটি দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা T-Helper কোষে প্রবেশ করে ভেতরের জেনেটিক পদার্থকে ধ্বংস করে ফেলে। পরবর্তীতে রোগীর মৃত্যু ঘটে।দেহের সকল জৈব তরলের মধ্যে T-Helper কোষ আছে। রক্ত, শুক্রাণু, ডিম্বাণু ইত্যাদির মধ্যে এর ঘনত্ব অনেক বেশি। সর্বপ্রথম **১৯৮১** সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইডস রোগ ধরা পরে। ডা: Mc Gottlieb সমকামী কিছু রোগীর দেহে বেশকিছু জটিল লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করেন। ব্যাপক পরীক্ষার মাধ্যমে এইডস রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। তবে এর কোনো প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি।

AIDS রোগের যে কয়েকটি কারণ চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেছেন তারমধ্যে অন্যতম হলো- সমকামীতা ও বহুকামীতা। একই লিঙ্গের ব্যাক্তি পরস্পর মিলিত হওয়াকে সমকামীতা এবং একই ব্যক্তি একাধিক ব্যক্তির সাথে মিলিত হলে তাকে বহুকামীতা বলে।

এইডস রোগে আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ৯০-৯৫% লোকই পুরুষ এবং এদের মধ্যে ৭৫% সমকামী কিংবা বহুকামী। এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, আমেরিকা ও যুক্তরাজ্যে সমকামী পুরুষের সংখ্যা যথাক্রমে **১২** মিলিয়ন ও ৯.৫ মিলিয়ন। এখন দেশগুলোতে এইডস রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

সমকামিতা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

"আর আমি লূতকে প্রেরণ করেছিলাম। সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল "তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের আগে বিশ্বজগতে কেউ করেনি।তোমরা নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে যৌন তৃপ্তির জন্য গমন করছ! তোমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।"

[সুরা আরাফ: ৮০-৮১]

এছাড়াও কুরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেছেন।

সমকামীতা তথা এইডসের ভয়াবহতা ও এর ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন:

"এরপর সূর্যোদয়ের সময়ে মহানাদ এদেরকে আঘাত করল; আর আমি জনপদকে উল্টিয়ে উপর-নিচ করে দিলাম এবং এদের ওপর প্রস্তর- কংকর বর্ষণ করলাম। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে।"

[সুরা হিজরঃ ৭৩-৭৫]

লুত সম্প্রদায়ের সমকামীদের ধ্বংস করার পর পৃথিবী AIDS মুক্ত ছিল। আমেরিকায় সর্বপ্রথম সমকামীদের দেহে এইডস দেখা দেয়।আর এখন তা পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।

মদ হারামের বৈজ্ঞানিক কারন

মানুষ যখন মাদকদ্রব্য যেমন-মদ, হিরোইন, কোকেন ইত্যাদি পান করে তখন মাদক দ্রব্যে থাকা কোটি কোটি পরমাণু রক্তে প্রবেশ করে। পরমানু ও রক্তকণিকার মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার পর তা স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলেছেন, মস্তিষ্কে এমন একটি স্নায়ুতন্তুর স্তর রয়েছে যাকে উত্তেজিত করার মতো প্রবল ক্ষমতা অ্যালকোহল তথা মাদক দ্রব্যের মধ্যে আছে।এ স্নায়ুতন্তুটির নাম হচ্ছে "ডোপামিন"। বস্তুত মাদক দ্রব্য গ্রহণ করার পর ডোপামিন উত্তেজিত হয়ে অন্যান্য স্নায়ুতন্তুকে সংকেত পাঠায় এবং কিছুক্ষণের জন্য স্বপ্নের জগতে হারিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও মনোযোগ, মনোনিবেশ, স্মরণশক্তি, বিবেচনা ক্ষমতা লোপ এবং মস্তিষ্কের কোষ সমূহের মধ্যে বিশৃংখলা ঘটে। একাধারে ৭-১০ দিন মাদকদ্রব্য সেবন করলে ডোপামিন গোটা স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং স্থায়ী আসক্তি সৃষ্টি হয় যা থেকে মুক্তি লাভ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। মাদক দ্রব্য সেবনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া শুরু হয় কিছুকাল পরে। তখন সেবনকারীর হাত-পা কাঁপে। কন্ঠস্বর বিকৃত হয়ে যায়। চেহেরায় ধূসর মলিন চাপ পড়ে।চুপচাপ থাকে। মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। পরিবারকে সময় দেয়না। পাকস্থলী বা লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বলেছেন, যদি ডোপামিন তন্তুতে কম্পন সৃষ্টি হয় তাহলে পারকিন্স রোগের পঙ্গুত্ব এসে যাবেই।

পবিত্র কুরআনে অ্যালকোহল বা মদ পানকারীদের ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কে যে তথ্য উল্লেখ আছে তা বর্তমান বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন:

"লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, "উভয়ের মধ্যে আছে 'মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; কিন্তু এদের পাপ উপকারের তুলনায় অধিক।"

[সুরা বাকারা: ২১৯]

সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বিঃ) থেকে বর্ণিত মহানবি মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, " সকল নেশা দ্রব্যই হচ্ছে মদ, আর সকল প্রকার মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণ হারাম।''

সুরা বাকারার **২১৯** নং আয়াতে অ্যালকোহলের যে সামান্য উপকারিতার কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে-ইনজেক্সান পুশিং করার সময়ে ত্বকে অ্যালকোহল ম্যাসাজ করা হয় আরামের জন্য, হাসপাতালে বিভিন্ন অপারেশনের সময় অ্যালকোহল ব্যাহত হয়, কেমিক্যাল এবং বায়ো-কেমিক্যাল দ্রব্য প্রিজার্ভ করতে অ্যালকোহল ব্যবহৃত হয়, রাসায়নিক পদার্থ নির্গত করতে অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয় , এছাড়া আরও অনেকক্ষেত্রে অ্যালকোহল ব্যবহারের এই উপকারিতার কথাই কুরআনে বর্ণিত আছে। তবে মনে রাখতে হবে দৈনন্দিন জীবনে ব্যাবহৃত এসব অ্যালকোহল কিন্তু সরাসরি নেশাসৃষ্টিকারী অ্যালকোহল নয় বরং অ্যালকোহলকে পরিশোধন করে তার নেশা সৃষ্টিকারী ধর্ম নষ্ট করে তারপর এটিকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

সুদের মধ্যে নেই কোনো বরকত

কুরআন ও বিজ্ঞান দুটোই সুদককে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক বলে আখ্যায়িত করেছে।সুদভিত্তিক সম্পদ শান্তির পরিবর্তে অনিষ্ট বয়ে আনে।সুদ শুধু নৈতিক দিক থেকে নয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও মানুষের ও সমাজের জন্য গভীর ক্ষতির কারণ হয়।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ সুদকে সরাসরি হারাম ঘোষণা করেছেনঃ

"যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দিয়ে পাগল করে। এটা এজন্যে যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতই।' অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং তার ব্যাপার আল্লাহ্ র ইখ্তিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই দোজখবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন আর দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।"
[সুরা আল-বাকারা: ২৭৫-২৭৬]

আল্লাহ আরও বলেছেনঃ

"যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না।"
[সুরা আল-বাকারা: ২৭৯]

এটি একমাত্র গুনাহ যেখানে আল্লাহ সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

বিজ্ঞানের (বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক) আলোকে সুদের ভয়াবহতাঃ

> ধনীর সম্পদ আরও ধনী করে, গরিব আরও গরিব হয়। সুদের মাধ্যমে সম্পদ একটি শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, যা আর্থ-সামাজিক বৈষম্য বাড়ায়।এটা "rich gets richer, poor gets poorer" পরিস্থিতি তৈরি করে।
> দারিদ্র্য ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করে।যারা ঋণ নেয়, সুদের বোঝা তাদের আর্থিকভাবে দুর্বল করে, মাসের পর মাস শোধ করেও ঋণ কমে না।
এটি দুশ্চিন্তা, হতাশা, আত্মহত্যা পর্যন্ত ঠেলে দিতে পারে।(বিশ্বব্যাপী বহু কৃষক আত্মহত্যা করেছেন সুদের বোঝা সহ্য করতে না পেরে)

> ব্যবসা ধ্বংস করে। সুদে ঋণ নিয়ে শুরু করা ব্যবসা সফল না হলে, মালিক ঋণ-সুদে দেউলিয়া হয়ে যায়। ব্যবসা থেকে মূল মানবিক গুণগুলো (সহানুভূতি, সহযোগিতা) হারিয়ে গিয়ে কেবল মুনাফার লোভ থেকে সিদ্ধান্ত হয়।

>অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে ।২০০৮ সালের গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিস-এর মূল কারণ ছিল সুদভিত্তিক অর্থনীতি (subprime mortgage crisis)।সুদের মাধ্যমে অর্থনীতি কৃত্রিমভাবে ফুলে ফেঁপে উঠে, তারপর ধ্বসে পড়ে, ফলে লাখো মানুষ চাকরি হারায়, গৃহহীন হয়।

সুদের উৎপত্তি ইহুদি জাতির হাতে।ইহুদি পুঁজিপতিরা (যেমন রথসচাইল্ড পরিবার) বহু আন্তর্জাতিক ব্যাংক, মিডিয়া ও কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। যুগে যুগে ইহুদিরা নানা দেশে গিয়ে ব্যবসা ও ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে মানুষকে শোষণ করেছে।মধ্যযুগে ইউরোপের অনেক দেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করা হয় (স্পেন, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স), কারণ তারা সুদ, চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতায় জড়িয়ে পড়েছিল।সুদভিত্তিক অর্থনীতি ছড়িয়ে দিয়ে মানবতার উপর ভারি বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে।

গান - বাজনার অপকারিতা

ইসলামে গান ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বেশ কিছু সতর্কবাণী রয়েছে। যদিও কুরআনে সরাসরি “গান-বাজনা হারাম” বলা হয়নি, তবে কিছু আয়াত ও হাদীস থেকে এর নেতিবাচক দিক ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

"আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে যারা 'বেহুদা কথা' সংগ্রহ করে, যাতে করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে এবং এটি হাসি-ঠাট্টার বিষয় বানায়। তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।"
[সুরা লুকমান:০৬]

তাফসীর অনুযায়ী, অনেক আলিম যেমন ইবনু কাসীর ব্যাখ্যা করেছেন, এখানে "বেহুদা কথা" বলতে গান ও বাদ্যযন্ত্র বোঝানো হয়েছে, যা মানুষের মনকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

রসুল (সাঃ) বলেছেনঃ “আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক আসবে যারা ব্যভিচার, রেশম, মদ্যপান এবং বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।”

সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৫৫৯০)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, গান ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করাকে রাসূল (সা.) একটি বিপথগামী প্রবণতা বলে ইঙ্গিত করেছেন।

বিজ্ঞানের আলোকে গানবাজনার অপকারিতা:বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সব গান খারাপ নয়, তবে অতিরিক্ত, উচ্চ শব্দ বা অশালীন/আবেগপ্রবণ গান শোনার কিছু নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে।যেমনঃ
> মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে,

> অতিরিক্ত উচ্চ ভলিউমে গান শুনলে স্ট্রেস হরমোন (কর্টিসল) বাড়তে পারে,
> ডিপ্রেশন বা একাকীত্ব অনুভবকারীরা অতিরিক্ত মেলানকোলিক গান শুনলে আরও বিষণ্ন হয়ে পড়তে পারেন,
> দীর্ঘ সময় ধরে হেডফোনে উচ্চ ভলিউমে গান শোনা শ্রবণশক্তির উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে (Noise-Induced Hearing Loss),
> সবসময় ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক চলতে থাকলে মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটে, বিশেষ করে পড়াশোনায়,
> অনেক আধুনিক গান অশ্লীল কথা, ইঙ্গিত ও ভিডিও দ্বারা যৌন উত্তেজনা ও অনৈতিক আচরণে উৎসাহ দেয় আর এটি সমাজে অনাচার বৃদ্ধি করে।

এমন অনেক গান আছে যেগুলোতে স্পষ্ট শিরকী বাক্য বিদ্যমান।এসব গান যদি কেউ সজ্ঞানে মুখে উচ্চারণ করে বা শুনে আনন্দ পায়,তাহলে তার ইমান থাকবেনা। যেসব গান মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে, অশ্লীলতা বাড়ায় বা আত্মার পবিত্রতা নষ্ট করে, সেসব গানবাজনাকে ইসলাম পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেছে এবং তা স্পষ্টভাবে নিন্দিত। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা যায়, এসব গান ও সঙ্গীত আমাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

গুনাহের প্রতি নিষেধাজ্ঞার বৈজ্ঞানিক কারণ

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

"শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি একে সুঠাম করেছেন। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।"
[সুরা আশ শামস : ৭-৮]

মানুষকে যে জীবনপদ্ধতি অনুসরণ করতে বলা হয়েছে, তা তার জন্য কল্যাণকর এবং রক্ষা ও শান্তির পথ।এমন অনেক কাজ আছে যেগুলো ইসলামে সুস্পষ্ট হারাম। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় মহান রব্বুল আলামিন তাঁর দেওয়া বিধানে কিছু কাজ সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন। অনেকেই বলে থাকেন ইসলামে এতো বিধিনিষেধ কেন?এটা করা যাবেনা,ওটা করা যাবেনা। কেন???এখন তাহলে এব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।
গুনাহর ফলে আত্মার অন্ধকার ও কলুষতা সৃষ্টি হয়।

"না, বরং তাদের কৃতকর্ম তাদের হৃদয়ে কালিমা সৃষ্টি করেছে।"
[সূরা আল-মুতাফফিফীন:১৪]

গুনাহ করলে মানুষের আত্মা ধীরে ধীরে পাথরের মতো শক্ত ও অন্ধ হয়ে যায়। তখন সে সত্যকে দেখতে ও বুঝতে পারে না।গুনাহ কেবল ব্যক্তিগত নয়; অনেক সময় তার প্রভাব পড়ে সমাজ ও পরিবেশেও — যেমন চুরি, মিথ্যা, জিনা, সুদ, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

“যখন কোনো জাতি প্রকাশ্যে গুনাহ করতে থাকে, তখন তাদের মধ্যে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যা পূর্বে কখনো দেখা যায়নি।”
(ইবনে মাজাহ)

• মদ,জুয়া, লটারিঃ

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

"হে বিশ্বাসীগণ! মাদকদ্রব্য, জুয়া, মূর্তি এবং তীর লটারি এ সকল গর্হিত বিষয় শয়তানী কাজ। অতএব এসব পুরোপুরি পরিহার কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

[সুরা মায়েদা: ৯০]

মদ পানের ভয়াবহতা সম্পর্কে আমরা সবাই জানি।মদ্যপান ও মাদকগ্রহণ শরীর ও স্নায়ুকে ধ্বংস করে।পূর্বের একটি টপিকে এব্যাপারে আলোচনা করেছি। আলোচ্য আয়াতে মদপানের পাশাপাশি জুয়াকেও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ- মদের মতো জুয়াও আসক্তি সৃষ্টি কারী, সামাজিক অপরাধ ও মানসিক ব্যাধি। অনেক স্বচ্ছল সম্পদশালী জুয়াড়ী আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। তখন অর্থের যোগানে চুরি, ডাকাতি, অন্যকে প্রবঞ্চিত করার মতো নানা সামাজিক অপরাধে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে।

লটারীকেও আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন। কারণ-লটারীর মাধ্যমে অর্থ প্রাপ্তি ঠিক যেন বহু লোকের নিকট থেকে সূক্ষ পন্থায় অর্থ চুরি করে নেয়ার শামিল।

সুতরাং এই থেকে এটা প্রতীয়মান যে মদ, জুয়া কিংবা লটারির মতো বিষয়গুলো মানুষের জন্য ধ্বংসাত্মক বলেই আল্লাহ এগুলোকে হারাম ঘোষণা করেছেন। আর এগুলোর ভয়ংকর পরিণতি আজ আমাদের সামনে সুস্পষ্ট এবং বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত।

• গানবাজনাঃ

ইসলামে গানবাজনাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত একটি আলোচনা পূর্বেই করে এসেছি।

• সুদঃ

সুদকে কুরআনে সুস্পষ্টভাবে হারাম তথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।সুদভিত্তিক অর্থনীতি সমাজে ধনী-গরিবের ব্যবধান বাড়ায়। এর ভয়াবহতা সম্পর্কে বিজ্ঞানের আলোকে একটি আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

• মিথ্যাকথা বলা,চুরি,ব্যাভিচারঃ

ইসলামে মিথ্যা কথা বলা,চুরি,ব্যাভিচার হারাম। কারন - বারবার মিথ্যা বলা, চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি মানুষকে অন্তর্দহন, অপরাধবোধ ও আত্মবিশ্বাসহীনতায় ভোগায়। পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টি করে।ব্যভিচার, পরকীয়া পরিবারব্যবস্থা ধ্বংস করে। বিজ্ঞান বলে এসব কাজ দীর্ঘমেয়াদে মানসিক রোগ যেমন অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন তৈরি করতে পারে।

• অশ্লীলতাঃ

ইসলামে অশ্লীলতা নিষিদ্ধ। এমনকি অশ্লীলতার ধারেকাছে যাওয়াও নিষিদ্ধ। বিজ্ঞানীদের মতে,অশ্লীলতা বা পর্ণোগ্রাফির প্রতি আসক্তি মস্তিষ্কের নিউরনের গঠন বদলে দেয় — dopamine deregulation হয়।

এখন আমরা কুরআন ও বিজ্ঞানের সমন্বয় করলে দেখতে পায়ঃ

> কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিতে গুনাহ আত্মার অন্ধকার সৃষ্টি করে।
বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে গুনাহ মানসিক সংকট তৈরি করে।

> কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিতে সুদ অবিচার ও শোষণ।
বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে সুদ আর্থিক বৈষম্য সৃষ্টি।

> কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যভিচার নৈতিক পতন। বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাভিচার পরিবার ধ্বংস ও রোগ ছড়ায়।

> কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিতে মিথ্যা ঈমান দুর্বল করে।
বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে মিথ্যা সামাজিক অবিশ্বাস তৈরি।

এছাড়াও ইসলামে আরও যত নিষিদ্ধ কাজ আছে সবগুলোরই এরকম বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।গুনাহের যে পরিণতি এই সিস্টেম আল্লাহ মানুষের মধ্যে সেট করে দিয়েছেন।তাই আল্লাহ যেহেতু জানেন কোন কাজের কি পরিণতি তাই তিনি মানুষকে গুনাহ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।আল্লাহ আমাদের গুনাহ করতে নিষেধ করেছেন কারণ তিনি আমাদের কল্যাণ চান — শুধু আখিরাতে নয়, এই দুনিয়াতেও।গুনাহ আত্মাকে কলুষিত করে, মনকে অস্থির করে, দেহকে অসুস্থ করে এবং সমাজকে বিশৃঙ্খল করে তোলে।কুরআন নির্দেশ দেয় আত্মা ও সমাজের পবিত্রতা রক্ষায়, আর বিজ্ঞান দেখায় গুনাহর বাস্তবিক ক্ষতির প্রমাণ। তাই গুনাহ থেকে বিরত থাকা আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের পাশাপাশি নিজের ও সমাজের উপকারও বয়ে আনে।সর্বোপরি গুনাহ থেকে বিরত থাকা একটি সুন্দর মানবজীবন গঠনের পূর্বশর্ত।আর ইসলাম মানুষকে সেই সুন্দর জীবন গঠনের নির্দেশ দেয়।তাই যাদের মনে "ইসলামে এতো বিধিনিষেধ কেন?এটা করা যাবেনা,ওটা করা যাবেনা। কেন?" এই প্রশ্ন বিদ্যমান আশাকরি তারা উত্তর পেয়ে গেছেন।গুনাহের ক্ষতিকর দিক আজ আমাদের কাছে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত।

ধৈর্য ধারণের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব

ধৈর্য (Sabr) শুধু ধর্মীয় শিক্ষা নয়, আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও এটি মানসিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুস্থতার জন্য অপরিহার্য এক গুণ। পবিত্র কুরআনে বহুবার ধৈর্য্য ধারণের কথা বলা হয়েছে, এবং আধুনিক সাইকোলজি, নিউরোসায়েন্স ও মেডিকেল গবেষণায়ও ধৈর্যের প্রভাব নিয়ে বিস্তর আলোচনা রয়েছে।

কুরআনে প্রায় ৯০ টিরও বেশি স্থানে ধৈর্য্যের গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন এবং প্রতিদান দেন।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেছেনঃ
"হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"
[সুরা আল-বাকারাহ :১৫৩]

"হে মুমিনগণ! ধৈর্য ধারণ করো, একে অপরকে ধৈর্যে উদ্বুদ্ধ করো, দৃঢ় থাকো, এবং আল্লাহকে ভয় করো যেন তোমরা সফল হও।"
[সুরা আল-ইমরান :২০০]

ইয়াকুব (আ.) এর ধৈর্য্যের কথা কুরআনে উল্লেখ আছে,

فَصَبۡرٌ جَمِیۡلٌ ؕ وَاللّٰهُ الۡمُسۡتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوۡنَ ۝

" সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্যস্থল।'
[সূরা ইউসুফ :১৮]

কুরআন দেখায় যে ধৈর্য শুধু কষ্ট সহ্য করা নয়, বরং তা আত্মনিয়ন্ত্রণ, আল্লাহর ওপর ভরসা এবং আখিরাতের প্রতিদান পাওয়ার প্রত্যাশা।

আধুনিক বিজ্ঞানে ধৈর্য মানে হলো Self-Control, Emotional Regulation, এবং Delayed Gratification – মানে তাৎক্ষণিক আনন্দকে নিয়ন্ত্রণ করে দীর্ঘমেয়াদে ভালো ফলের অপেক্ষা করা।

নিউরোসায়েন্সের দৃষ্টিতে, ধৈর্য্য ধারণে মস্তিষ্কের Prefrontal Cortex অংশ সক্রিয় থাকে। এ অংশটি আমাদের যুক্তি, নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। ধৈর্যশীল মানুষদের এই অংশ বেশি কার্যকর থাকে, ফলে তারা চাপের মধ্যে সহজে ভেঙে পড়ে না। ধৈর্য ধারণ করলে কর্টিসল নামক স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা কম থাকে, যা হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ও মানসিক রোগের ঝুঁকি কমায়।

‘Marshmallow Test’ (Stanford, 1972):
এই পরীক্ষায় দেখা গেছে, যারা শিশু বয়সে ধৈর্য ধারণ করতে পেরেছিল (একটি মার্শমেলো না খেয়ে অপেক্ষা করতে), তারা বড় হয়ে বেশি সফল, স্বাস্থ্যবান ও আত্মনিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

ধৈর্য্য কোনো দুর্বলতা নয়; বরং এটি এক শক্তি, যা মানুষকে অভ্যন্তরীণভাবে সুসংহত, আত্মনিয়ন্ত্রিত ও মানসিকভাবে দৃঢ় করে তোলে। কুরআন আমাদের শেখায় ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথ। বিজ্ঞানও প্রমাণ করেছে, ধৈর্য্য মানুষকে দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যবান, সফল ও আনন্দিত করে। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধৈর্য অনুশীলনই প্রকৃত প্রজ্ঞার পরিচায়ক।

ধৈর্য কেবল ধর্মীয় গুণ নয়, বরং তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রশিক্ষণযোগ্য এবং অর্জনযোগ্য একটি জীবনের দক্ষতা। আসুন, আমরা ধৈর্য্য ধারণের গুরুত্ব বুঝে তা চর্চা করি—মন, শরীর এবং আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য।

সালাত আদায়ের বৈজ্ঞানিক রহস্য

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

"সূর্য হেলে পড়বার পর হতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফজরের সালাত।নিশ্চয়ই ফজরের সালাত উপস্থিতির সময়।"

[সুরা বনী-ইসরাইন: ৭৮]

আলোচ্য আয়াতে সূর্য হেলে পড়বার পর থেকে রাত্রির ঘন, অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম দ্বারা যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা-এই চার নামাজের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। ফজরের সালাতকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ-ফজরের নামাজ আদায়ের জন্য মানুষেকে ঘুম থেকে জাগতে হয়। ফলে অন্য নামাজ অপেক্ষা এ নামাজে কষ্ট বেশি হয়। তাই আলাদাভাবে উল্লেখ করে এ নামাজের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই আয়াত ছাড়াও কুরআনে প্রায় ৭০+ স্থানে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে সালাতের গুরুত্ব, আদেশ ও প্রভাব উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ কেন এতো গুরুত্বসহকারে মানুষকে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবার বিজ্ঞানের আলোকে এর রহস্য উন্মোচন করা যাক।

সালাত বা নামাজ ইসলামে শুধু একটি ধর্মীয় ইবাদত নয়; এটি শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতার জন্যও অত্যন্ত উপকারী। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নামাজের বিভিন্ন উপকারিতা তুলে ধরা হয়েছে। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনা করা হলো:

ডোপামিন নিঃসরণ বৃদ্ধি: নিয়মিত নামাজ পড়া মস্তিষ্কে ডোপামিনের মাত্রা বাড়ায়, যা মানসিক প্রশান্তি ও সুখানুভূতি জাগায় ।

স্ট্রেস ও উদ্বেগ হ্রাস: নামাজের মনোযোগ ও ধ্যান মস্তিষ্ককে প্রশান্ত করে, মানসিক চাপ কমায় এবং উদ্বেগ হ্রাস করে ।

পেশি ও হাড়ের ব্যায়াম: নামাজের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি যেমন রুকু, সেজদা ও কিয়াম শরীরের পেশি ও হাড়ের জন্য উপকারী ব্যায়াম হিসেবে কাজ করে ।

রক্ত সঞ্চালন উন্নতি: সেজদার সময় মাথায় রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি পায়, যা মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ায় এবং উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে ।

হজম প্রক্রিয়া উন্নতি: নামাজের নিয়মিত অনুশীলন হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে এবং বিপাকীয় কার্যক্রমে সহায়তা করে ।

সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা: পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মানুষের মধ্যে সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করে, যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আধ্যাত্মিক সংযোগ: নামাজ আল্লাহর সঙ্গে একটি গভীর আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপন করে, যা আত্মিক প্রশান্তি ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে ।
সুতরাং ১৪০০ বছর আগে আল্লাহ মানুষকে সালাত আদায়ের প্রতি যত্নবান হওয়ার নির্দেশ করেছেন মানুষের ইহকালিন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য তা আজ বৈজ্ঞানিকভাবে সুস্পষ্ট।

সালাতের তিন নিষিদ্ধ সময়

মহান রব্বুল আলামিন পাঁচটি নির্ধারিত সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় ফরজ করেছেন। কুরআনে সালাতের সময় নিয়ে বলা হয়েছে:

“সালাত কায়েম কর সূর্য ঢলে পড়া থেকে শুরু করে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত, এবং ফজরের সময় কুরআন তিলাওয়াত কর, নিশ্চয় ফজরের কুরআন তিলাওয়াত প্রত্যক্ষযোগ্য।”
[সূরা ইসরা: ৭৮]

আলোচ্য আয়াতে সূর্য হেলে পড়বার পর থেকে রাত্রির ঘন, অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম দ্বারা যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা-এই চার নামাজের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। লক্ষ করলে দেখা যায়,সালাতের যে তিন নিষিদ্ধ সময় আছে সেই সময়গুলোতে কিন্তু আল্লাহ সালাত আদায়ের নির্দেশ দেননি। বরং তিনি নিজ থেকে পাঁচটি উপকারী সময় নির্ধারন করে দিয়েছেন। আর সালাতের তিন নিষিদ্ধ সময় সম্পর্কে আমার নবীজি (সাঃ) এর হাদীস থেকে জানতে পারি।সেই তিনটি সময় হলো:

১.সূর্য উদিত হওয়ার সময়
২.মধ্যাহ্নে সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপরে থাকে (যেন স্থির দাঁড়িয়ে আছে)
৩.সূর্য ডোবার ঠিক আগে (মাগরিবের পূর্ব মুহূর্তে)

বৈজ্ঞানিক (অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল) দৃষ্টিকোণঃ

> সূর্য উদয়ের ও ডোবার সময়ে
সূর্যের রশ্মি বেশি তীব্র ও একদিকে ধ্বংসাত্মক, কারণ এই সময় সূর্যের আলো মাটির দিকে খাড়া কোণে পড়ে। আলট্রাভায়োলেট (UV) রশ্মি এই সময়ে চোখে ও ত্বকে ক্ষতি করতে পারে। প্রাচীন যুগে বহু সূর্যপূজারী ঠিক এই সময়ই পূজা করত।

ইসলামে এ সময় সালাত নিষিদ্ধ করা হয়েছে শিরক থেকে রক্ষা এবং ইবাদতের স্বতন্ত্রতা রক্ষার জন্য।

> সূর্য মাথার উপর স্থির থাকা
এই সময় পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট স্থানে সূর্য থাকে একদম মাথার উপরে (Zenith Position)।এটি খুবই সংক্ষিপ্ত সময় (মাত্র ৫–১০ মিনিট)। এই সময় প্রকৃতপক্ষে কোনো ছায়া থাকে না।ঐতিহাসিকভাবে, এ সময়টিও সূর্য উপাসনার সময় ছিল। মধ্যাহ্নের তাপমাত্রা এবং মানুষের জৈবিক ক্লান্তি এ সময় সর্বোচ্চ থাকে। এই সময় বিশ্রাম করাও বিজ্ঞানসম্মত।বিজ্ঞান বলে সূর্যের তীব্র রশ্মি ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনায় এ সময় বিশ্রাম ভালো।

ইসলাম শিরক প্রতিরোধ ও ইবাদতের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে এই তিন সময় নিষিদ্ধ করেছে। এমনি বৈজ্ঞানিকভাবেও এই তিন সময়ের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা হয়েছে।

কীবলামুখী হয়ে নামাজ পড়ার বৈজ্ঞানিক রহস্য

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা কিবলামুখী হয়ে সালাত (নামাজ) আদায়ের নির্দেশ দিয়ে বলেছেনঃ

"অতএব, তুমি তোমার মুখ পবিত্র মসজিদের (কাবা) দিকে ফেরাও।"

[সূরা বাকারা :১৪৪]

এটা আল্লাহর একটি আদেশ।মুসলমানদের ঐক্য, শৃঙ্খলা ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের প্রতীক।কাবা হলো তাওহীদ ও ইবাদতের কেন্দ্র।কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো মানে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায়ের কিছু রহস্য -

• জীববিদ্যা ও দিক নির্ধারণ:

>মানুষের শরীর চৌম্বকীয় তরঙ্গ (bio-electromagnetic field) তৈরি করে।

>পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ড এবং দিকনির্দেশ শরীর ও মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে।

>একই দিকে মুখ করে হাজার হাজার মানুষ নামাজ পড়লে একটি সমবেত শক্তি-ভবন (coherent alignment) তৈরি হয় — যা মানসিক প্রশান্তি ও ফোকাস বাড়াতে সাহায্য করে।

• মানসিক স্বাস্থ্য ও মনঃসংযোগ:

>কিবলার দিকে মনোযোগ করে দাঁড়ানো, রুকু, সিজদা — এগুলো মাইন্ডফুলনেস (mindfulness)-এর মতো কাজ করে।

>বিশেষ করে মুখ, বুকে ও মাথায় এক নির্দিষ্ট দিক নির্ধারণ মানসিক একাগ্রতা বাড়ায়।

• ঐক্যবদ্ধতা ও ভারসাম্য:

>পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ একই স্থানের দিকে ফিরে একই কাজ করে — যা একধরনের বৈশ্বিক মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য তৈরি করে।

>এটি সামাজিক সংহতি ও ধর্মীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়ক।

• ভৌগোলিক সুবিধা ও দিক চর্চা:
>কিবলা নির্ধারণে মানুষ দিক ও অবস্থান চিনতে শেখে — যা ন্যাভিগেশন ও ভূগোল জ্ঞানের একটি বাস্তব প্রয়োগ।

বাস্তব উদাহরণ:
অনেক মেডিটেশন পদ্ধতিতে (যেমন ইয়োগা, তিব্বতি মেডিটেশন) দিক নির্ধারণ করে ধ্যান করা হয় — কারণ তারা বুঝেছে, দিক ও মনঃসংযোগে একধরনের স্নায়বিক ভারসাম্য কাজ করে।

কিবলামুখী হয়ে সালাত কেবল ধর্মীয় দায়িত্ব নয়, বরং এর পেছনে আছে মনস্তাত্ত্বিক, ভৌগোলিক ও জীববৈজ্ঞানিক রহস্য।এটি আমাদের ঈমান, একাগ্রতা ও শরীর-মন — সবকিছুর ভারসাম্য রক্ষা করে।

ওযুর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

পবিত্র কুরআন আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

“আল্লাহ পছন্দ করেন তাদের, যারা পবিত্রতা অবলম্বন করে।”
[সূরা তাওবা:১০৮]

সুতরাং ওযু হচ্ছে একধরনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পবিত্রতা, যা আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায়।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেনঃ

"হে মু’মিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্যে প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে আর তোমাদের মাথা মসেহ্ করবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে; যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। তোমরা যদি পীড়িত হও বা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ শৌচস্থান হতে আসে, বা তোমরা স্ত্রীর সঙ্গে সংগত হও এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে এবং তা দিয়ে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মসেহ্ করবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না ; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।"
[সূরা মায়িদা :০৬]

ওযু শুধু শারীরিক পরিচ্ছন্নতা নয়, বরং আত্মিক প্রস্তুতি।আল্লাহ বিধান আরোপে কঠোরতা করতে চান না। সর্বত্রই তিনি সহজ ও সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখেছেন।

বিজ্ঞানের আলোকে ওযুর উপকারিতাঃ
>প্রতিদিন ৫ বার মুখ, হাত, পা ধোয়ার ফলে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস দূর করে।শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও জীবাণু দূরীকরণে সহায়ক।

>চোখ, মুখ, নাক ধোয়ার ফলে Eye infection ও Respiratory infection কমে।
>ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ, হাত ধোয়া Parasympathetic Nervous System সক্রিয় করে — যার ফলে মানসিক প্রশান্তি ও মনোযোগ বৃদ্ধি পায়।
>পা ও হাত ধোয়ার ফলে blood circulation বাড়ে, ও ঘুমের আগে ওযু করলে ঘুম গভীর হয়।
>হাত, মুখ, পা ঘষা হয় — এটি acupressure বা reflexology-র মতো কাজ করে, যা শরীরের শক্তি প্রবাহ ঠিক রাখতে সাহায্য করে।

সুতরাং পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইবাদাতের পূর্বপ্রস্তুতির পাশাপাশি মানুষের স্বাস্থ্যের কল্যাণার্থে মহান রব্বুল আলামিন ওযু করার নির্দেশ দিয়েছেন।

বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন পাঠের গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনে মহান রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেনঃ

"আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা মু'মিনদের জন্যে আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা জালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।"
[সূরা আল-ইসরা:৮২]

অর্থাৎ,কুরআন অন্তরের রোগ যেমন দুশ্চিন্তা, ঈর্ষা, হতাশা ইত্যাদির চিকিৎসা।এছাড়াও বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসা।আত্মিক প্রশান্তি ও আলোর পাথেয়।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেনঃ

"এই সে কিতাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই, এটা মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।"
[সূরা বাকারা :০২]

অর্থাৎ,জীবনের সব সংকট ও সিদ্ধান্তে সঠিক পথ দেখায়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত:

>কুরআনের তেলাওয়াত শুনলে হৃদস্পন্দন কমে।>মানসিক চাপ হ্রাস পায় এবং মস্তিষ্কে সেরোটোনিন ও ডোপামিন বাড়ে।

>এটি Mindfulness therapy-র মতো কাজ করে।

>Arabic phonetics ও কুরআনিক ছন্দবদ্ধ পাঠ নিউরোলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বাড়ায়, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে।

>Qur'anic memorization (হিফজ) করলে working memory শক্তিশালী হয়।

> (ex: Journal of Religion and Health) গবেষণায় পাওয়া গেছে, নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত শুনলে blood pressure ও anxiety কমে।

>সূরা মুলক, সূরা ইয়াসিন ইত্যাদি ঘুমের আগে পাঠ করলে deep sleep বা REM sleep উন্নত হয় বলে অনেক গবেষণায় পাওয়া গেছে।

অতএব,কুরআনের আলোকে কুরআন পাঠের ফযীলত হচ্ছেঃ পথনির্দেশ, আরোগ্য,আত্মিক শান্তি, সওয়াব, নাজাত।
বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন পাঠের উপকারীতা হচ্ছেঃ স্ট্রেস হ্রাস, মনোযোগ বৃদ্ধি, স্মৃতিশক্তি উন্নয়ন, ঘুম ভালো হওয়া, হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণ।

আখিরাতের অন্তহীন জীবন

আখিরাতের জীবন সম্পর্কে কুরআন বারবার ঘোষণা দিয়েছে যে, তা চিরস্থায়ী, অন্তহীন এবং অবিনাশী।
পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেনঃ

"যারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে শুভ সংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে আছে জান্নাত-যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাদেরকে ফলমূল খেতে দেওয়া হবে তখনই তারা বলবে, 'আমাদেরকে পূর্বে জীবিকারূপে যা দেওয়া হত এটা তো তাই; তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেওয়া হবে আর সেখানে তাদের জন্যে পবিত্র সঙ্গিনী রয়েছে, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।"
[সুরা আল বাকারা:২৫]

মহান আল্লাহ আরও বলেছেনঃ

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, অবশ্য আমি প্রবিষ্ট করাব তাদেরকে জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহর সমূহ। সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্ত্রীগণ। তাদেরকে আমি প্রবিষ্ট করব ঘন ছায়া নীড়ে।"
[সুরা নিসা : ৫৭]

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেনঃ

"আর যারা সৌভাগ্যবান, তারা জান্নাতে থাকবে যতদিন আকাশ ও পৃথিবী থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্য কিছু ইচ্ছা করেন — এটি এক নিরবচ্ছিন্ন দান।"
[সূরা হুদ : ১০৮]

চিরকাল (خالدين فيها أبدا) — এই শব্দগুচ্ছ বহুবার এসেছে, যা স্পষ্ট করে আখিরাতের জীবনের সময়সীমা অসীম। অর্থাৎ,জান্নাত ও জাহান্নামের জীবন অন্তহীন — কোনো মৃত্যু থাকবে না।

এবার বিজ্ঞানের আলোকে অনন্ত জীবনের ধারণা
আলোচনা করা যাক।আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আখিরাতের অনন্ত জীবনকে সরাসরি প্রমাণ করতে না পারলেও, কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক চিন্তা এটিকে সম্ভাবনার চোখে দেখে।

>পদার্থবিজ্ঞানে সময় ও অনন্ততা:

"Time" হলো একটি মাপযোগ্য মাত্রা, কিন্তু সময়ের শুরু ও শেষ নিয়ে পদার্থবিদরা আজও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি। Stephen Hawking ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, সময় শুরু হয়েছিল বিগব্যাং থেকে ।কিন্তু বিগব্যাং এর আগের সময় সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কিছুই জানতে পারেনি বিজ্ঞানীরা।ফলে আখিরাতের অনন্তজীবনের সময় বুঝতেও আমাদের বিজ্ঞান সীমিত।

> তত্ত্বগত অনন্ত জীবন (Theoretical Immortality):

জৈবপ্রযুক্তি ও AI গবেষকরা "digital immortality" বা চেতনাকে সার্বক্ষণিকভাবে সংরক্ষণের ধারণা উপস্থাপন করেছেন। যদিও তা কল্পবিজ্ঞানসম পর্যায়ে আছে।তবে এসব থেকে বোঝা যায়, মানুষ অন্তহীন জীবন ধারণা বিজ্ঞানেও অনুসন্ধান করছে।
> কোয়ান্টাম ফিজিক্স ও বহুমাত্রিক বাস্তবতা:

কিছু কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলছে, আমাদের চেনা সময়-স্থান ছাড়াও ভিন্ন মাত্রা (dimensions) আছে, যেখানে সময় ভিন্নভাবে কাজ করে।

আখিরাত হতে পারে এমন এক জগত যেখানে সময় নেই, অথবা সময় অবিরত ও বৃত্তহীন — যা বিজ্ঞানের কাছে এখনো রহস্য।

আখিরাতের জীবন কুরআনের দৃষ্টিতে নিশ্চিত ও চিরস্থায়ী — তাতে সময়ের কোনো সীমা নেই।
বিজ্ঞান এখনও এমন জগৎকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে না পারলেও সময়ের অসীমতা ও অতিপ্রাকৃতিক বাস্তবতার ধারণাগুলো ক্রমশ সামনে আসছে। আখিরাত হলো এমন এক জীবন যেখানে সময় বলতে কিছু নেই।আখিরাতের অন্তহীন সময়ের কনসেপ্ট টা আমাদের কাছে কঠিন লাগতে পারে,কিন্তু আল্লাহর কাছে তা অতি সহজ একটা ব্যাপার!

যেখানে বিজ্ঞান থেমে যায়, সেখানে ঈমান আমাদের আলো দেয়। আর ঈমান বলে, আখিরাতই হলো আমাদের প্রকৃত গন্তব্য — যেখানে মৃত্যু নেই, শুধুই চিরন্তন শান্তি অথবা শাস্তি!

জান্নাতের বিশালতার প্রমাণ

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

"তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্যে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণে ঈমান আনে। এটা আল্লাহ্ র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন; আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।"

[সূরা হাদীদ : ২১]

আল্লাহ জান্নাতের প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের সমান বলেছেন। এর মানে, জান্নাতের বিশালতা আমাদের পরিচিত মহাবিশ্বের বিশালতার চেয়েও অনেক বেশি, কিংবা একে তুলনার জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বিশালতাকে উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে।

বিজ্ঞানের আলোকে জান্নাতের বিশালতার ধারণা:
আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বের পরিধি প্রায় ৯৩ বিলিয়ন আলোকবর্ষ। এক আলোকবর্ষ মানে আলো এক বছরে যত দূর যায় ।এই বিশালতা শুধু পৃথিবী নয়, কোটি কোটি ছায়াপথ, গ্রহ, তারা ও মহাশূন্য জুড়ে রয়েছে।আর এখন পর্যন্ত মহাবিশ্বের যে পরিধি আবিষ্কৃত হয়েছে তা কিন্তু প্রথম আসমানের নিচের অংশমাত্র। আর জান্নাতের বিশালতা আসমান ও জমিনের সমান। একটি আসমান নয় বহু আসমান।

মাল্টিভার্স ও চতুর্থ মাত্রা (4D space):
আধুনিক পদার্থবিদ্যা (theoretical physics) যেমন স্ট্রিং থিওরি বা মাল্টিভার্স ধারণা অনুযায়ী বলছে, এই মহাবিশ্ব ছাড়াও আরও বহু মহাবিশ্ব থাকতে পারে।

কুরআনে বলা হয়েছে, মানুষ জান্নাতের সত্যিকারের রূপ কল্পনাও করতে পারে না। এই মহাবিশ্ব যদি এত বিশাল হয়, তাহলে জান্নাত তার চেয়েও অসীম, অতিপারমাণবিক এক বাস্তবতা।

একটি উদাহরণ দিয়ে জান্নাতের বিশালতা বোঝানোর চেষ্টা করছিঃ
পৃথিবীর শুরু থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত যত মুমিন এসেছিলেন, এখন আছেন,ভবিষ্যতে আসবেন; মহাবিশ্বের গ্রহগুলোকে যদি আল্লাহ জান্নাত বানিয়ে দেন তাহলে আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি এবং পার্শ্ববর্তী গ্যালাক্সি এন্ড্রোমিডাতে স্থিত নক্ষত্রের গ্রহগুলোর অর্ধেক বেচে যাবে। দুই লাখ কোটি গ্যালাক্সির মধ্যে শুধু দুইটি গ্যালাক্সির নক্ষত্র ও গ্রহগুলোর কথা বলছি।মিল্কিওয়ে ও এন্ড্রোমিডা বাদে আরও দুই লাখ কোটি গ্যালাক্সির কথা বাদই দিলাম।আল্লাহু আকবার! আমি বলছিনা যে এই নক্ষত্র - গ্রহগুলোকেই আল্লাহ জান্নাত বানিয়ে দিবেন। বরং এটা শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার নিদর্শন দিয়েই বোঝালাম।তাহলে এবার কি একটু বোঝা গেল? প্রকৃত জান্নাত কেমন তা শুধু আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহ তায়ালা মোট আটটি জান্নাত সৃষ্টি করেছেন। হতে পারে একেকটি জান্নাতের বিশালতা এই মহাবিশ্বের চেয়েও বিশাল।পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালার বর্ণনাতে সেটাই সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

জান্নাত হতে পারে এমন এক আধ্যাত্মিক ও অতিপ্রাকৃতিক জগত, যা সময়, স্থান ও পদার্থের সীমা ছাড়িয়ে — বিজ্ঞান এর চূড়ান্ত সীমানাতেও পৌঁছাতে অক্ষম।জান্নাতের রূপ চোখে দেখা, কানে শোনা যায় না এমনকি হৃদয় দিয়ে কল্পনাও করা যায়না এমন এক বাস্তবতা যা বিজ্ঞানের বাইরে। জান্নাতের বিশালতা শুধু জায়গার পরিমাণে নয়, বরং তার গুণ, সৌন্দর্য ও পরম সুখের বিশালতায়ও অতুলনীয়। কুরআনের ভাষায়, তা আসমান ও জমিনের চেয়েও বড়; আর বিজ্ঞানের ভাষায়, এটি এমন এক অস্তিত্ব যা আমাদের চেনা মহাবিশ্বেরও বহু বাইরে।

এই বিশাল জান্নাত আমাদের জন্য তৈরি — যদি আমরা আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী চলি।

(সমাপ্ত)

রেফারেন্স

১. বিজ্ঞানময় কুরআন

২. কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান

৩. দৈনিক জনকণ্ঠ

৪. দৈনিক ইনকিলাব

৫. তাফসীর ইবনে কাসীর

৬. YouTube channel: Islam and life